জুলভার্ন

মরুশহর

শামসুদ্দীন নওয়াব

একটি বাংলাপিডিএফবই এক্সক্লুসিভ

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

আপনাদের প্রিয় ওয়েবসাইট Banglapdf.net এখন ডোমেইন নেইম পরিবর্তন করে BanglaPdfBoi.Com এ রুপান্তরিত হয়েছে। আপনারা সবাই নিজ নিজ বুকমার্কস পরিবর্তন করে নিবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

মরুশহর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২

এক

ভূপৃষ্ঠের তিনলক্ষ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল সাহারা মরুভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তখনকার যে কোন নিখুঁত এবং আধুনিক ম্যাপেও বিরাট এই ভূখণ্ডকে ফাঁকা জায়গা হিসেবে দেখানো হত। অজ্ঞাত এই অঞ্চলে কি আছে, জানত না এমনকি বড় বড় ভূগোল বিশারদেরাও। এই সময়টাতেই সাহারার দিকে চলেছিল বারজাক মিশন।

কাহিনীটা শোনা যাক। সাহারার কাছাকাছি অঞ্চলে যারা বাস করে, সেই দুর্ধর্ষ কাফ্রীদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী কিছুদিন (বারজাক মিশন নাইজার বাঁকের দিকে রওনা দেবার সময়) ধরেই শোনা যাচ্ছে। প্রায়ই নাকি অতিকায় ডানাওয়ালা কালো পাখি মুখ দিয়ে আগুন ঝরাতে ঝরাতে সাহারার দিকে উড়ে যায়। চিররহস্যে ঘেরা সেই আদিম এলাকা হতে টগবগিয়ে বেরিয়ে আসে আগুনের ঘোড়া। এর মালিক খোদ শয়তান। হাতে তার ভয়ঙ্কর আগুনের লাঠি। ঘোড়ার জ্বলন্ত শ্বাসে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় গ্রাম, গাছপালা, ঘরবাড়ি। গরীব নিগ্রোদের সর্বস্ব লুট করে ঘোড়ার মালিক। ধরে নিয়ে যায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে। বাধা দিলেই নির্মম মৃত্যু। শিশুদের পর্যন্ত নির্বিচারে খুন করে রেখে যায়, এমনি নিষ্ঠুর শয়তান।

কেউ জানে না ওরা কারা। কেন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে, মানুষ খুন করে যায় নির্বিচারে। সাহারার মত আরেক মরুভূমি সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন লোকালয়গুলোতে। সত্যিই কি নরক থেকে উঠে এসেছে সাক্ষাৎ কোন শয়তান?

নাইজারের দুই তীরের একশো মাইল দূর পর্যন্ত বসবাসকারী মানুষ ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সারাক্ষণ, কখন এসে আবার দলবল নিয়ে হানা দিয়ে বসে শয়তান। অত যে অত্যাচার করছে, তবু শয়তানের আস্তানায় হানা দেবার সাহস হয় না কারও। আর হানা দেবেই বা কি? কোথায় সে আস্তানা কেউ জানলে তো!

শয়তানের আস্তানা কিন্তু একটা আছে। মানুষ শয়তান। বিচিত্র এক শহরের মালিক সে। আর এই শহরের অবস্থানও বিচিত্র জায়গায়। একেবারে সাহারার ধূ-ধূ মরুর বুকে। অমন আজব কথা শোনেনি কখনও কেউ। আর শুনলেও হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যিই এক অত্যাশ্চর্য শহর গড়ে উঠেছে মরুভূমির বুকে।

জমজমাট শহর। বাচ্চাকাচ্চা বাদ দিয়ে লোকসংখ্যা ৬,৮০৮। নামটাও অদ্ভুত। ব্ল্যাকল্যান্ড।

ব্ল্যাকল্যান্ডের অধিবাসীরা কিন্তু বিশেষ একটা জাত নয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের, সমস্ত অঞ্চলের মানুষ এসে ঠাঁই নিয়েছে এখানে। এখানকার নাগরিক হতে

চাইলে একটাই যোগ্যতা দরকার। দাগী আসামী হতে হবে। যে যত বেশি নিষ্ঠুর, যে যত অন্যায় করতে পারে, ব্ল্যাকল্যান্ডের সমাজে সে তত উঁচু পদের অধিকারী। কোন একটা বিশেষ ভাষাও নেই এই শহরের। থাকবে কি করে, নাগরিকরা যে সব এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তবে বিভিন্ন ভাষী লোক থাকলেও জাতীয় ভাষা কিন্তু ইংরেজি। গভর্নমেন্টের ভাষাও এটাই। ছোট্ট যে খবরের কাগজটা বেরোয়, ইংরেজিতে। শহরের সঙ্গে কাগজটার নামও মিলিয়ে রাখা হয়েছে, 'ব্ল্যাকল্যান্ড থান্ডারবোল্ট'।

অদ্ভুত শহরের অদ্ভুত কাগজে কি খবর বেরোত জানেন? দু'একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শোনাচ্ছি:

'লাঞ্চ খাবার পর মালিককে তামাকের পাইপ দিতে ভুলে গিয়েছিল নিগ্রো ভৃত্য কোরোমোকো। তাই আজ তাকে ফাঁসি দিচ্ছে মালিক জন অ্যানড্রু।'

'দশজন মেরি ফেলোকে নিয়ে হেলিপ্লেনে করে কৌরকৌসৌ আর বিডি গ্রামে যাবেন কর্নেল হিরাম হার্বার্ট, আগামীকাল সন্ধে ছ'টায়। গত তিন বছরে এ দুটো গ্রামে হানা দেয়া হয়নি। লুটপাট আর প্রচুর পরিমাণে খুন জখম করে রাতের বেলাই ফিরে আসবেন কর্নেল।'

'নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, বারজাক নামের এক ডেপুটির নেতৃত্বে কোনাক্রি থেকে শিগগিরই একটা ফরাসী অভিযাত্রীদল রওনা হবে। সিকাসো আর ঔঘাদোগৌ হয়ে মিশন পৌঁছবে নাইজারে। তবে আমরাও তৈরি। লোক রওনা হয়ে গেছে আমাদের। কুড়িজন ব্ল্যাক গার্ড আর দু'জন মেরি ফেলোকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড রুফুজ। তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈনিক। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর ছদ্মনামে বারজাক হারামজাদার দলে ঢুকে পড়বেন রুফুজ। মিশন ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করবেন।'

'ভয়ানক খেপে গিয়েছিলেন আজ কাউন্সিলর এহ্‌ল উইলিস। মেরি ফেলো কন্সটানটিন বার্নার্ডকে এই সময় সামনে পেয়ে তাকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আদেশ পালিত হয়ে গেল। এমনিতেই বার্নার্ডের খুলিটা বেয়াড়া রকম বড়। তার ওপর ভেতরে একডজন সীসের বুলেট নিয়ে রেড রিভারে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে তলিয়ে গেল লাশ। দেখে মহাখুশি কাউন্সিলর। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বার্নার্ডের জায়গায় নতুন মেরি ফেলো নেয়া হয়ে গেছে। নাম গিলম্যান ইলি। সারা বিশ্বের নাগরিক। আসলে সারা বিশ্বেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন তো, নাগরিক না হয়ে কি করবেন। অবশ্যই সরকারীভাবে নাগরিকত্ব দেয়নি তাঁকে পৃথিবীর লোক। বরং উনত্রিশ বছর জেলে আর পঁয়ত্রিশ বছর জাহাজের খোলে থাকার দণ্ড দিয়েছে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড আর জার্মানীর আদালত। এহেন লোককে মেরি ফেলো হিসেবে পেয়ে ব্ল্যাকল্যাণ্ড ধন্য। সিভিল বডি থেকে বার্নার্ডের কোয়ার্টারে এসে গেছেন ইলি। শুভেচ্ছা রইল, যেন শিগগিরই তাঁকে বার্নার্ডের চাইতে বেশি কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়।'

এই তো গেল কালোদেশের বজ্র পত্রিকার খবরাখবরের ধারা। এবারে দেশের অন্যান্য খোঁজখবরও কিছু নেয়া যাক।

শহরের রীতি, চীফ আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ছাড়া, পদবী ধরে ডাকা হবে

না। ডাক নামটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে।

সবারই ডাক নাম আছে। যাদের জন্মগতভাবে ছিল না, ব্ল্যাকল্যান্ডের নাগরিক হবার পর দেয়া হয়েছে। আর সবার মত চীফেরও ডাক নাম আছে একটা। ভয়ঙ্কর নাম। কিলার। পুরো নাম হ্যারি কিলার।

বারজাক মিশন যেদিন রওনা দেয়, তার ঠিক দশ বছর আগে এসে হাজির হয়েছিল সাহারার এই অঞ্চলে কিলার। কোথা থেকে তার আগমন, কোন্ দেশের নাগরিক কেউ জানে না। এসেই আজকের শহরের ঠিক মাঝখানে একটা খুঁটি পুঁতে বলেছে, তাঁবু ফেল। এই তাঁবুকে ঘিরেই সৃষ্টি হবে শহর। এরপর থেকে ম্যাজিকের মতই মরুভূমির মাঝে গজিয়ে উঠেছে অত্যাশ্চর্য শহর।

হ্যারি কিলারের হুকুমে খটখটে শুকনো খাদ তাফাসেট আউদ ভরে উঠল পানিতে, রাতারাতি নদী বয়ে গেল। নদীর নাম রাখল কিলার, রেড রিভার। নদীর বাঁ দিকে সমতল ভূমিতে আধখানা চাঁদের আকৃতিতে গড়ে উঠল শহর। অর্ধচন্দ্র শহরের বাঁকা পিঠের বেড় বারোশো গজ, আর চাঁদের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত সোজাসুজি লম্বা ছ'শো গজ। মোট জমি তিনশো বিঘার বেশি। চাঁদের মত পিঠের বেড়কে তিরিশ ফুট উঁচু আর তিরিশ ফুট পুরু জমাট কাদার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। এটাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে ভেতর থেকে।

শহরের প্রথম অংশে থাকে ব্ল্যাকল্যান্ডের খানদানী ব্যক্তিরা। তারাই মেরি ফেলো। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার স্বয়ং হ্যারি কিলারের আদিবন্ধু। বর্তমান পদের চাইতে আরও উচ্চাসনে আসীন হবার আশা আছে এদের ভবিষ্যতে। শহরের আদিমতম পুরুষও কিন্তু এরাই। দেখতে দেখতে এই খানদানী মেরি ফেলোদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে জেল পালানো, জাহাজ পালানো শত শত খুনে আসামীর দল। সবাইকে আশ্বাস দিয়েছে কিলার, এখানে মনের সুখে নিজেদের নারকীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ দেয়া হবে। দিয়েছেও। মেরি ফেলোদের বর্তমান সংখ্যা সীমিত—পাঁচশো ছেষট্টি।

অনেক ধরনের কাজ করতে হয় মেরি ফেলোদের। ব্ল্যাকল্যান্ডের সৈন্যবাহিনীও এরাই। সামরিক পদ্ধতিতে গঠিত মেরি ফেলোদের মধ্যে আছে একজন কর্নেল, পাঁচজন ক্যাপ্টেন, দশজন লেফটেন্যান্ট, পঞ্চাশজন সার্জেন্ট। অন্যেরা সবাই সৈনিক। লুটপাট, খুনজখম, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নারীধর্ষণ আর শিশুহত্যা করে কার্যক্ষম নিগ্রোদের ধরে এনে গোলাম বানিয়ে রাখাই হলো এদের যুদ্ধ। পুলিসের কাজও করে এই মেরি ফেলোরাই। মুগুর হাঁকিয়ে শায়েস্তা করে রাখে শহরের নাগরিকদের। এক চুল এদিক ওদিক হলেই রিভলভার চালায়, নইলে ধরে জবাই করে। শহরের যাবতীয় কাজ আর মাঠের চাষাবাদ গোলামদের দিয়ে করানোও এদেরই দায়িত্ব। চীফের বডিগার্ডের কাজও এদের মধ্যে থেকেই লোক বেছে নিয়ে করানো হয়। তাই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় মেরি ফেলোদের।

প্রথম আর তৃতীয় অংশের মাঝখানে পাঁচিল ঘেরা দ্বিতীয় অংশে রাখা হয় গোলামদের। এলাকাটা প্রায় সত্তর একরের মত। গোলামের সংখ্যা পাঁচ হাজার সাতশো আটাত্তর। এর মধ্যে চার হাজার একশো ছিয়ানব্বই জন পুরুষ, বাকি স্ত্রীলোক। দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই এদের।

রোজ সকালে ঘেরা পাঁচিলের চারটে দরজা খুলে যায়। মুগুর আর চাবুকের নির্মম আঘাত সয়ে তাড়া খাওয়া কুকুরের মত হুড় হুড় করে চারটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে গোলামরা। মাঠে কাজ করতে যায়। সাঁঝের বেলা আবার ক্লান্ত পশুর মত ফিরে আসে ডেরায়। পালানোর কোন উপায় নেই এদের, এমনি কঠোর বিধিব্যবস্থা। দু'দিকে তো আছেই দুনিয়ার সবচেয়ে নরপিশাচ কতগুলো লোক, মেরি ফেলো আর সিভিল বডি।

গরু-ছাগলের মত থাকতে না পেরে আর কষ্ট সইতে না পেরে গোলামদের অনেকেই মরে যায়। তারও বেশি মরে মেরি ফেলোদের মুগুর খেয়ে আর বন্দুকের গুলিতে। কিন্তু গোলামের সংখ্যা কমে যাওয়ার ভয় নেই। মরার পরদিনই নাইজারের দুই তীরের গ্রামগুলো থেকে নতুন গোলাম এসে যায়। ধরে নিয়ে আসা হয়।

শহরের তৃতীয় অংশে থাকে সিভিল বডি। এরা সাদা চামড়া ঠিকই কিন্তু প্রথম অংশে থাকার অধিকার নেই। তবে প্রমোশন পেয়ে মেরি ফেলো হয়ে গেলে চলে যায় প্রথম অংশে। বেশি দেরিও হয় না অবশ্য। কালোদেশের কালো আইনের বলে যখন তখন জবাই হয়ে যায় মেরি ফেলোরাও। শূন্যস্থান পূর্ণ করে এসে তখন সিভিল বডির কেউ।

মেরি ফেলোদের খাওয়া পরার ভার নিয়েছে চীফ স্বয়ং। কিন্তু সিভিল বডির লোকদের নিজের ব্যাপার নিজেকেই দেখতে হয়। ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা রেড রিভারের তীরের বাণিজ্য কেন্দ্রে। নবাবী হালে থাকার জিনিসপত্র চুরিডাকাতি ও লুটপাট করে বাইরের দুনিয়া থেকে নিয়ে আসে সিভিল বডির সওদাগররা। এদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায় মেরি ফেলোর লোক আর সিভিল বডির অব্যবসাদাররা। ইউরোপীয় দেশে তৈরি অনেক মূল্যবান সামগ্রী চীফের কাছ থেকেও কেনে ব্যবসায়ীরা, ওগুলোই আবার বিক্রি করে মেরি ফেলোদের কাছে। এই সব জিনিস চীফ কোথায় পায়, কেবল তার অতিবিশ্বস্ত সাগরেদরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

এই গেল রেড রিভারের ডান পাড়ের অবস্থা। কিন্তু এই শেষ নয়। বাঁ পাড়েও আছে শহর। নদীর তীর থেকে জমি আচমকা খাড়া হতে হতে দেড়শো ফুটে গিয়ে ঠেকেছে। নদী বরাবর বারোশো গজ আর নদী থেকে তিনশো গজ দূর পর্যন্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আয়তাকার এই দ্বিতীয় নগরীটা আয়তনের দিক দিয়ে প্রথম নগরীর চেয়ে খুব একটা ছোট নয়। লম্বালম্বি পাঁচিল দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত।

উত্তর-পুব দিকে পাহাড়ের ঢালের ওপর পড়েছে একটা ভাগ। এখানে রয়েছে পাবলিক পার্ক। নাম ফোর্ট্রেস গার্ডেন। মেরি ফেলো আর সিভিল বডির এলাকায় যাওয়া যায় এই পার্ক থেকে, গার্ডেন ব্রিজ দিয়ে।

পাহাড়ের চুড়োয় রয়েছে দ্বিতীয় ভাগটা। ব্ল্যাকল্যান্ডের হৃৎপিণ্ড এই অংশটাই।

ফোর্ট্রেস গার্ডেনের লাগোয়া, উত্তর কোণে পাহাড়ের নব্বই ফুট উপরে অবস্থিত একটা বিশাল চতুষ্কোণী প্রাসাদ, চারদিকে পাঁচিল ঘেরা। এর দক্ষিণ-পুবে রেড রিভার। প্রাসাদের নাম কিলার প্যালেস। এখানেই তার নবরত্ন নিয়ে বাস করে স্বয়ং হ্যারি কিলার। নবরত্ন সত্যিই নয়জন অতি গুণধর রত্ন নিয়ে গঠিত। প্রমোশন দিয়ে দিয়ে কাউন্সিলর পদে তোলা হয়েছে এদেরকে। চীফের প্রতিটি কুকর্মের সঙ্গে

জড়িত থাকে এই নবরত্ন। হুকুম আসে চীফের কাছ থেকে, বিনা প্রতিবাদে পালন করে তারা।

প্রাসাদ থেকে প্রথম শহরে যাওয়ার আরেকটা লোহার ব্রিজ আছে। রাতে এই ব্রিজের মুখ লোহার গ্রিল নামিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়।

দুটো ব্যারাক আছে প্রাসাদের লাগোয়া। একটায় থাকে পঞ্চাশজন বাছাই করা নিগ্রো। বুদ্ধিমান কিন্তু অকল্পনীয় নিষ্ঠুর এই ব্ল্যাকগার্ডরা। দ্বিতীয় ব্যারাকে থাকে চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গ। এরাও বাছাই করা। ব্ল্যাকগার্ডদের চেয়ে কম তো নয়ই বরং বেশি পিশাচ এরা। উড়ুক্কু মেশিন বা হেলিপ্লেন চালানোর ভার এদের ওপর। এছাড়াও অন্যান্য আরও কাজ করে এরা।

এক অদ্ভুত আবিষ্কার এই হেলিপ্লেন। (জুল ভার্ন এই কাহিনী লেখার সময় হেলিপ্লেন, অর্থাৎ আজকের হেলিকপ্টার আর প্লেনের মিশ্রণ শুধু অদ্ভুত নয়, অবিশ্বাস্য ছিল। এই কাহিনী পড়ার সময় পাঠকের নিজেকে অন্তত একশো বছর আগের মানুষ কল্পনা করে নিতে হবে নইলে কাহিনী পড়ার মজা কমে যাবে অনেকখানিই।) একটা বিস্ময়। অসাধারণ প্রতিভাবান মস্তিষ্কের এক অসামান্য সৃষ্টি। একবার মাত্র জ্বালানি নিয়ে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ আড়াইশো মাইল গতিতে একটানা তিন হাজার মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে এই আকাশযান। এই হেলিপ্লেনের দৌলতেই এত কুকর্ম করেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে ব্ল্যাকল্যান্ডবাসী। এরই জন্যে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হ্যারি কিলার।

নাইজারের আশপাশে শত শত মাইল পর্যন্ত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে হ্যারি কিলার স্রেফ এই হেলিপ্লেনের সহায়তায়। নিগ্রোরা প্লেনের চালকদের ভাবে খোদ শয়তান, আর যানটাকে বিচিত্র আগুনের পাখি। এর আওয়াজ শুনলেই থরহরিকম্প শুরু হয়ে যায় ওদের। আতঙ্কে তটস্থ হয়ে থেকে ভাবতে থাকে, কার ওপর আবার কুনজর পড়ল শয়তানের।

ব্ল্যাকল্যান্ডে নিজের লোকদের মধ্যেও পুরোপুরি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে হ্যারি কিলার। তার নাম শুনলেই এই শহরের অতি বড় বড় ক্রিমিনালরাও শামুকের মত গুটিয়ে যায়। কাঁপুনি শুরু হয় হৃৎপিণ্ডের। কিন্তু তবু বিদ্রোহের সম্ভাবনা মন থেকে উড়িয়ে দেয়নি অসাধারণ দূরদর্শী হ্যারি। তাই লোকের ধরাছোঁয়ার বাইরে উঁচু জায়গায় প্রাসাদ বানিয়েছে। গার্ডেন, ব্যারাক আর শহরের দিকে ফেরানো রয়েছে অত্যাধুনিক কামানের বড় বড় নল। সোজা কথা, নবরত্নরা একবার এসে মিছেমিছিও যদি বলে, বিদ্রোহ শুরু হতে যাচ্ছে, খোঁজ নিয়ে সত্যিমিথ্যে যাচাইয়ের ধারে কাছেও যাবে না হ্যারি কিলার, রক্ত নদী বইয়ে ছাড়বে সমস্ত ব্ল্যাকল্যান্ডে।

লোকগুলোকে বাদ দিলে অতি উন্নতমানের শহর ব্ল্যাকল্যান্ড। ঝকঝকে পরিষ্কার। মেরি ফেলোদের ঘরে ঘরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অঢেল আয়োজন। মেরি ফেলো আর সিভিল বডির সবাইয়ের ঘরে একাধিক টেলিফোন। আর আলো-পানির তো কোন অভাবই নেই। এমন কি গোলামদের এলাকায়ও অকৃপণ হাতে বিদ্যুৎ আর পানির পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করেছে খুনে হ্যারি।

শুধু শহরের ভেতরেই নয়, বাইরেও বিস্ময়কর সব জিনিসের ব্যবস্থা করেছে হ্যারি। যেন যাদুর কাঠি বুলিয়ে শহরের প্রান্ত থেকে অনেক অনেক দূরে মরুভূমির

বালির সমুদ্রকে বিদেয় করেছে সে। শহরের সীমানায় দাঁড়িয়ে দিগন্তের যতদূর চোখ যায়, দেখা যাবে শুধু ফসলের খেত। তাক লাগানো বিচিত্র উপায়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা করেছে নিষ্ঠুর লোকটা।

কুকর্ম না করলে ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে থাকত হ্যারি কিলার কোন সন্দেহ নেই। সাহারার বুকে যেখানে পানি কিংবা সবুজের নামগন্ধও নেই, এমন এলাকায় মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সব্জী খেত, সত্যিই বিস্ময়কর নয় কি? এতসব কাণ্ড যিনি ঘটালেন, সেই অকল্পনীয় লোকটির কথায়ই আসছি এবার।

পাহাড়ের উপরের হ্যারি কিলারের প্রাসাদই শহরের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র নয়, সত্যিকার প্রাণ অন্য জায়গায়। নদীর বাঁ-পাড়ের শহরের প্রথম ভাগের মধ্যে আরেকটা শহর আছে। কিন্তু ধরন-ধারণ আর গড়ন একেবারে আলাদা। এটা ফ্যাক্টরি। এই ফ্যাক্টরির পেছনে অকৃপণ হাতে টাকা ঢালে হ্যারি কিলার। কারণ এরই জন্যে সৃষ্টি হয়েছে ব্ল্যাকল্যান্ডের, রাজা হয়ে বসেছে হ্যারি। মনে মনে কিন্তু এই ফ্যাক্টরি আর তার পরিচালককে দারুণ ভয় পায় হ্যারি কিলারও। সমীহ করে। বাইরের বিশ্বের কল্পনারও অতীত অদ্ভুত সব কলকব্জা আছে এই ফ্যাক্টরিতে।

সমস্ত দুনিয়ার সেরা সেরা শ'খানেক ব্রেন তুলে আনা হয়েছে এই ফ্যাক্টরির জন্যে। বিজ্ঞানের সাধনায় কিংবা টাকার লোভে হ্যারি কিলারের বশ্যতা স্বীকার করেছে এরা।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিবাহিতও আছে। মেয়েলোকের সংখ্যা এখানে সাতাশ। বাচ্চাকাচ্চারাও রয়েছে।

ব্ল্যাকল্যান্ডের অন্যান্য অধিবাসীদের মত ক্রিমিনাল এরা নয়, বরং উল্টো। ফ্যাক্টরির ভেতরে যথেচ্ছ স্বাধীনতা আছে এদের, কিন্তু চৌহদ্দির বাইরে এক পা বাড়ানোর আদেশ নেই। চাকরিতে ঢোকার সময়েই এই নিয়মের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। বাইরের দুনিয়ায় চিঠি লেখার অধিকারও নেই এদের। সোজা কথা মোটা টাকার বিনিময়ে অনেককেই কিনে নিয়েছে হ্যারি কিলার।

চাকরি নিয়ে ফ্যাক্টরিতে ঢোকার পর যদি কারও ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হয়, বাধা দেয় না হ্যারি। হেলিপ্লেনে করে স্বদেশে ফিরিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। আসলে ফ্যাক্টরির অন্য বিজ্ঞানীদের দেখানো হয়, যেন বিদ্রোহ করে না বসে। কারণ বিজ্ঞানীরা বিদ্রোহ করে বসলেই হ্যারি কিলার গেছে। ধ্বংস হয়ে যাবে তার অত সাধের ব্ল্যাকল্যান্ড। তাই দেশে ফিরিয়ে নেবার নাম করে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির মাঝে মেরে রেখে আসে হ্যারি কিলারের স্যাঙাতরা, স্বদেশে ফিরতে ইচ্ছুক বিজ্ঞানীকে। তার জমানো টাকার পাহাড় আবার ফিরে আসে হ্যারি কিলারেরই হাতে। সোজা কথা, ভাঁওতা দিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিচ্ছে ব্ল্যাকল্যান্ডের অধীশ্বর।

এই ফ্যাক্টরির পরিচালকের নাম মারসেল ক্যামারেট। জাতে ফরাসী। ফ্যাক্টরির শ্রমিক-কর্মচারী, বিজ্ঞানীদের চোখে সাক্ষাৎ দেবতা। ব্ল্যাকল্যান্ডের সর্বত্র যাবার অধিকার হ্যারি কিলারের মত একমাত্র এঁরই আছে। কিন্তু সারা শহর ঘুরে বেড়ালেও এই আপনভোলা লোকটাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই হ্যারির। কারণ পথে

হাঁটার সময়ও আপন চিন্তায় বিভোর থাকেন বিজ্ঞানী। আশপাশে কি ঘটছে, চেয়েও দেখেন না। ব্ল্যাকল্যান্ড নিয়েও মাথা ঘামান না ক্যামারেট। তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধারণা ফ্যাক্টরি আর এর যন্ত্রপাতি।

ক্যামারেটের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। মাঝারি উচ্চতা। সুন্দর স্বাস্থ্য। ঠেলে বেরিয়ে আছে ব্যায়ামপুষ্ট বুক। মাথায় হালকা চুলের রঙ সোনালী। কথা বলেন আস্তে, শান্ত স্বরে। কোনদিন রেগে গিয়ে তিনি গলা চড়িয়েছেন, বলতে পারবে না কেউ। অসহিষ্ণু হন না কখনও। যতই সহজ সরল হোন, ভীতু নন তিনি মোটেই। সমস্ত শরীরের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর তাঁর চোখ জোড়া। গভীর নীল চোখ দুটো দেখলেই ভেতরের অসামান্য প্রতিভা আঁচ করা যায়।

ক্যামারেটের সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আঁচ করা যায়। আয়নার ওপর দিয়ে হালকা কুয়াশা ভেসে গেলে যেমন হয়, মাঝে-মাঝে ঘোলাটে হয়ে ওঠে তাঁর চোখ। নিষ্প্রভ দেখায়। তারপরেই ক্ষণিকের জন্যে শূন্য হয়ে যায় চাহনি। অভিজ্ঞ লোক দেখলেই বুঝতে পারবে, সামান্য ছিট আছে ক্যামারেটের মাথায়।

কল্পনার বিচিত্র জগতে বাস মারসেল ক্যামারেটের। আর সেই কল্পনাকেই একে একে বাস্তবায়িত করে চলেছেন বিজ্ঞানী। দশ বছর আগে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানোর চিন্তা তাঁরই মাথায় উদয় হয়েছিল। সরল মনে যাকে ইচ্ছে, কথাটা শোনাতেন তিনি। লোকে হাসত। অবজ্ঞার হাসি। পাগল দেখে যেমন হাসে লোকে। কিন্তু হ্যারি কিলার হাসেনি। বরং ব্যাপারটাকে সে ভাল মত ভেবে দেখে। হোক ক্রিমিনাল, কিন্তু তার জগতে সে ক্যামারেটের চেয়ে কম নয়। তাই ঠিকই ক্যামারেটকে চিনেছিল সে।

বিরাট পরিকল্পনাকে নিয়ে সাহারার এই অংশে এসে হাজির হলো হ্যারি কিলার। সঙ্গে কয়েকজন অতিবিশ্বাসী অনুচর। আর অবশ্যই মারসেল ক্যামারেট। সব রকমে বিজ্ঞানীকে সাহায্য করে গেল হ্যারি। আর সত্যিই, নিজের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করে সাহারার বুকে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরালেন ক্যামারেট। আর একের পর এক আশ্চর্য সব জিনিস আবিষ্কার করে গেলেন। এর জন্যে প্রচুর টাকা লাগে। কিন্তু অতসব বোঝেন না ক্যামারেট। তাঁর প্রয়োজন মত একেকটা জিনিসের ফরমাশ করেন হ্যারি কিলারের কাছে, বিনাবাক্যব্যয়ে জুগিয়ে যায় হ্যারি। একবার ভেবেও দেখেন না ক্যামারেট, হ্যারি কি করে কোথা থেকে অতসব বহু মূল্যবান জিনিস কেনার টাকা জোগাড় করে। তাঁর প্রয়োজনমত জিনিস পেলেই তিনি খুশি।

তাঁর আবিষ্কারকে কোন্ কাজে লাগাল হ্যারি কিলার তাও দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না ক্যামারেট। তাঁর আবিষ্কৃত জিনিস কাজ করলেই তিনি সন্তুষ্ট। হ্যারি কিলার বৃষ্টি চেয়েছে, ঝরিয়েছেন ক্যামারেট। দিয়েছেন একটি মাত্র মোটর-চালিত অদ্ভুত কৃষিযন্ত্র, যা দিয়ে একাধারে জমিতে লাঙল দেয়া যায়, আগাছা সাফ করা যায়, বীজ বোনা যায়, শস্য কাটা যায়, যায় শস্যকে খাওয়ার উপযোগী করে তোলা। উড়ুক্কু যন্ত্র বানিয়েছেন ক্যামারেট। বানিয়েছেন আরও কত কি।

মোটামুটি এই হলো ব্ল্যাকল্যান্ড আর এর অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ঘটনার দিন, বেলা এগারোটা। নিজের প্রাইভেট রুমে একাকী বসে হ্যারি

কিলার গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন।

ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিল হ্যারি, 'শুনছি।'

'পশ্চিমে সতেরো ডিগ্রি দক্ষিণে দশটা হেলিপ্লেন আসতে দেখা যাচ্ছে।'

'আসছি ।' রিসিভার নামিয়ে রাখল হ্যারি।

প্যালেসের ছাদে যেতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। তারপর লিফটে চড়ে তিরিশ ফুট উঁচু একটা টাওয়ারের চূড়ায় উঠে গেল হ্যারি। প্ল্যাটফর্মে একজন মেরি ফেলো দাঁড়িয়ে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে কি যেন দেখছে। এইমাত্র হ্যারিকে টেলিফোন করেছে সে-ই।

ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে টেলিস্কোপে চোখ ঠেকাল হ্যারি। দেখতে দেখতেই বলল, 'কাউন্সিলরদের খবর দাও। নিচে থাকব আমি।'

প্যালেস আর ফ্যাক্টরির মাঝখানে এসপ্ল্যানেড। লিফটে চড়ে, সিঁড়ি বেয়ে সেখানে নেমে গেল হ্যারি। মিনিট খানেকও যায়নি, কিন্তু এরই মধ্যে জায়গা মত হাজির হয়ে গেছে নবরত্ন। হ্যারির ইঙ্গিতে আকাশের এক বিশেষ দিকে চাইল সবাই।

আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে হেলিপ্লেনগুলো, বড় হচ্ছে। আর কয়েক মিনিট পরে এসে একে একে আলতো করে নেমে পড়ল এসপ্ল্যানেডে।

দশটার মধ্যে চারটে প্লেনে শুধু পাইলট। অন্য ছ'টায় পাইলট ছাড়াও আছে দু'জন করে আরোহী। একজন করে ব্ল্যাকগার্ড আর একজন বন্দী। বন্দীদের চোখ কাপড়ে ঢাকা, হাত-পা বাঁধা। হ্যারির ইঙ্গিতে বাঁধন খুলে দেয়া হলো বন্দীদের, চোখের সামনের কাপড়ও সরিয়ে নেয়া হলো। বিমূঢ় বিস্ময়ে সামনের বিশাল প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। দেখছে অতি উঁচু টাওয়ার, চারপাশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, আর দশটা উড়ুক্কু যন্ত্র।

বন্দীদের ঘিরে আছে তিরিশজন ব্ল্যাকগার্ড। পাথরের স্ট্যাচ্যুর মত স্থির। ওদের দিকেও অবাক বিস্ময়ে তাকাল বন্দীরা।

একশো গজ পেছনে আড়াইশো গজ লম্বা নিরেট পাঁচিলের ওপারে আকাশছোঁয়া ফ্যাক্টরির চিমনি দেখে অবাক হলো বন্দীরা। বিশাল উঁচু উঁচু পাইলনের কি প্রয়োজন, তাও অনুমান করতে পারল না তারা। আর কোথায় কোন্ দেশে দাঁড়িয়ে আছে তাও বোধগম্য হলো না। আফ্রিকার ম্যাপ তাদের খুঁটিয়ে দেখা আছে, অভিযানে রওনা দেবার আগেই। কিন্তু এই ধরনের শহরের অস্তিত্ব কোথাও আছে বলে জানে না তারা।

আবার ইঙ্গিত করল হ্যারি কিলার। ঘাড় ধরে ছ'জন বন্দীকে প্রবেশ করানো হলো প্যালেসে। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ব্ল্যাকল্যান্ডের একচ্ছত্র অধিপতির খপ্পরে এসে পড়ল বারজাক মিশনের ছয়জন অভিযাত্রী।

দুই

(আমিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে)

২৫ মার্চ। বন্দী হওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। মোটামুটি শান্তিতেই কেটেছে গত রাতটা। সকালবেলা, এখন একটু ভাল লাগছে। তাই লিখতে বসেছি। কিন্তু এ কোথায় এলাম? চাঁদে?

বললে বিশ্বাস করবেন? উড়ে এসেছিলাম। না, বেলুন নয়, উড়োজাহাজ। রীতিমত এঞ্জিন লাগানো আকাশযান। সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের চাইতে কয়েকগুণ বেশি জোরে ছুটতে পারে।

সেন্ট বেরেন ছাড়া আমাদের সবারই শরীর ভাল। কোমরের বাতে শুয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। আকাশযানের মেঝেতে একটানা বেকায়দাভাবে শুইয়ে রাখার ফলেই এই অবস্থা হয়েছে তাঁর।

বন্দী হবার কথাটা তো মনেই আছে আপনাদের। সেই বিকট আওয়াজের পর সার্চলাইটের আলো। তারপর কয়েকজন মশালধারীর ঘিরে ধরা।

আমাদের ধরে শক্ত পিছমোড়া করে বাঁধল মশালধারীরা। ধরে তুলে ইয়া বড় বড় থলের ভেতর ঢোকাল। আচ্ছা করে কষে বাঁধল থলের মুখ। ময়দার বস্তার মত ফেলে রাখল মাটিতে।

পড়ে আছি তো আছিই। কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে, বলতে পারব না। হঠাৎ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠস্বর, 'সব ক'টাকে ভরা হয়েছে?'

চমকে উঠলাম। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর।

এক সঙ্গে উত্তর দিল কয়েকটা কণ্ঠ, 'হয়েছে।'

'ঠিক আছে, নিয়ে চলো তাহলে।'

অনুভব করলাম, বস্তার দু'দিক থেকে তুলে ধরে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল ওরা আমাকে। প্রায় বিশ মিনিট পর একটা জায়গায় এনে দড়াম করে মাটিতে ফেলে দিল। মনে হলো, কোমরটা ভেঙে গেছে। ব্যথায় কুঁকড়ে গেলাম। হেঃ হেঃ করে বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠল কেউ।

'এই যে, নিচে নেমে এসো তোমরা। সবাই।' কাদের যেন আদেশ দিল ল্যাকোর।

'কিন্তু এখানে তো পারব না, ক্যাপ্টেন। বড্ড বেশি গাছপালা।' এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন ছাপিয়ে কানে এল জার্মান ভাষায় জবাব।

অবাক লাগল। না, জার্মান ভাষা শুনে নয়। কণ্ঠস্বরটা এসেছে শূন্য থেকে। গাছের মাথার উপর থেকে যেন কথা বলছে লোকটা।

'ঠিক আছে, ওই যে, ওদিকেই খোলা জায়গাটায় নেমে পড়ো জলদি।' আবার আদেশ দিল ল্যাকোর। তারপর অন্য কাদেরকে আবার আদেশ দিল, 'এই হতচ্ছাড়াগুলোকে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে যাও।'

আবার চ্যাংদোলা করে তুলে নেয়া হলো আমাকে। অনুমানেই বুঝলাম, আমার সঙ্গীদেরকেও একই ভাবে বয়ে নেয়া হচ্ছে।

হঠাৎই প্রচণ্ড গর্জন উঠল। কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। এই আওয়াজই গত কয়েকদিনে বার বার শুনে এসেছি। একটু আগেও এই আওয়াজই শুনেছি।

কিছুদূর এসে আবার ধপাস করে ফেলে দেয়া হলো আমাকে। মাথার ওপরে শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড গর্জন।

'কি হলো, নামছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল ল্যাকোর।

'জমি খারাপ। নামা যাবে না।' আবার আকাশ থেকেই উত্তর এল। এবার ইটালিয়ান ভাষায়।

ব্যাপার কি? ভাষাবিদদের রাজত্বে এসে পড়লাম নাকি!

'তাহলে কোথায় নামতে চাও?'

'অন্তত বিশ কিলোমিটার দূরে। এর আগে নামার জায়গা একেবারেই নেই।' উত্তর দিল আকাশচারী।

'তার মানে কৌরকৌসৌর সমতল জায়গায় নামতে চাও?' জিজ্ঞেস করল ল্যাকোর।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন!'

'ঠিক আছে। যাও। আমরাও শিগগিরই পৌছে যাচ্ছি।' আবার গর্জন উঠল। ক্রমেই বাড়ছে। পড়ে থেকে অনুভব করলাম, দেহের তলায় থরথর করে কাঁপছে মাটি, আওয়াজের প্রচণ্ডতায়। বস্তার ভেতর থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ঈশ্বরই জানেন এ কিসের আওয়াজ!

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? নিয়ে চলো বোকা পাঁঠাগুলোকে।' ধমকে উঠল ল্যাকোর।

আবার চ্যাংদোলা করে তুলে নেয়া হলো আমাকে। কিছুদূর নিয়ে ফেলা হলো আবার। কিন্তু এবারে মাটিতে নয়। বুঝলাম, ঘোড়ার পিঠে। বোধহয় জিনের সঙ্গেই আলুর বস্তার মত বাঁধা হলো আমাকে। চটাস করে চাঁটি পড়ার শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠে ছুটল ঘোড়া।

মাজেপ্পা'স রাইড কবিতায় পড়েছি, মাজেপ্পাকে বুনো ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল এক খেপা জমিদার। অসমতল পাহাড়ী উপত্যকা অধিত্যকা পেরিয়ে ছুটেছিল ঘোড়া। ঝাঁকুনির চোটে পটপট করে ভেঙেছিল মাজেপ্পার হাড়গোড়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু মরেনি মাজেপ্পা। কসাকরা বাঁচায় তাকে। এবং একদিন কসাকদের কমান্ডার হয়েছিল সে-ই। কিন্তু আমারও মাজেপ্পার অবস্থা হবে, ভাবিনি। কিন্তু এটা ঠিক জানি, এই অঞ্চলে কসাক নেই। সুতরাং আমাকে বাঁচাবারও কেউ নেই।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মনে হচ্ছে, শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত থাকবে না। একটু নড়েচড়ে উঠতে গেলাম। বস্তার ভেতরে সুবিধে করতে পারলাম না। কিন্তু এটুকু নড়াচড়াই টের পেয়ে গেল লোকটা। আমার ঘোড়ায়ই চড়েছে। বীভৎস কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান, ব্যাঙের বাচ্চা। বেশি নড়লে খুলি ফুটো করে দেব।'

গলা শুনেই বুঝতে পারলাম, যা বলছে করবে লোকটা। তাই আর নড়াচড়া করলাম না।

প্রচণ্ডগতিতে ছুটছে ঘোড়া। মাঝে মাঝেই আমার পাশে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে মানুষের গোঙানির আওয়াজ আসছে। আমারই মত সঙ্গীদেরও বস্তায় ঢুকিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা হয়েছে, বুঝলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা উন্মত্তের মত ছুটল ঘোড়া। তারপর থামল, হঠাৎ করেই। বাঁধন খুলে বস্তায় পোরা অবস্থায়ই মাটিতে ফেলে দেয়া হলো আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে। চেঁচিয়ে উঠলাম। অসাড় হয়ে গেছে যেন দেহটা।

আশপাশেও চিৎকার উঠল। সেন্ট বেরেনের চিৎকারটা পরিষ্কার চিনলাম। বারজাকও চেঁচালেন। কিন্তু জেনের কোন সাড়া নেই।

'কিরে, মেয়েটা মরে গেল নাকি?' অশুদ্ধ ইংরেজিতে এক ডাকাত আরেক ডাকাতকে জিজ্ঞেস করছে।

ধক করে উঠল আমার হৃৎপিণ্ড। ঠিকই আমিও জেনের সাড়া পাচ্ছি না গত এক-দেড় ঘণ্টা যাবৎ।

'খুলে দেখ তো বস্তাটা।' বলল আরেকজন।

অপেক্ষা করে রইলাম। বুকের ভেতর বেড়ে গেছে ধুকপুকানি।

'নাহ,' বলল তৃতীয় একজন, 'মরেনি। বেহুঁশ হয়ে গেছে। হবেই। যা খেল দেখিয়েছে না শালার ঘোড়াটা আমার,' বলে খিক খিক করে হাসল লোকটা।

হঠাৎই থেমে গেল সবার হাসি। শব্দ পেলাম, আরেকটা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে। লাফ দিয়ে নামল কেউ। বুটের শব্দ হলো। তারপর আদেশ হলো, 'সবকটা বস্তার মুখ খুলে দেখ তো।' ল্যাকোরের গলা। 'মরে গেলে ঠ্যাং ধরে নিয়ে গিয়ে ওই খাদটায় ফেলে দাও।'

আমার বস্তাটার মুখ খোলা শুরু হতেই মরার ভান করে পড়ে থাকলাম। খুলে গেল মুখ। মরে গেছি কিনা বোঝার জন্যে আমার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কেউ। নিজের অজান্তেই উহ্ করে উঠলাম।

'আহাহা, ঘুম ভেঙে গেছে। একটু চাও তো, বাছা।' ল্যাকোরের গলা।

মিট মিট করে চাইলাম। সোজা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে ল্যাকোর। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল আমার।

এই সময়েই ল্যাকোরের আসল নাম জানতে পারলাম। তার একজন অনুচর এসে ডাকল ক্যাপ্টেন রুফুজ।

আমার দেহতল্লাশী করার আদেশ দিল রুফুজ। বস্তা থেকে বের করে আনা হলো আমাকে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। শরীরটাকেও একটু নড়াবার সুযোগ পেলাম।

দ্রুত আমার দেহতল্লাশী হয়ে গেল। টাকা পয়সা, ছুরি, রিভলভার সব কেড়ে নিল ডাকাতেরা। কিন্তু নোটবইটা একবার খুলেও দেখল না। বের করে মলাটটার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই আবার রেখে দিল আমার পকেটে। ব্যাটারা একেবারেই মূর্খ, বুঝতে পারলাম।

আমার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। আহ্! কি আরাম! দড়ির দাগ বসে যাওয়া জায়গাগুলো হাত দিয়ে ডলতে লাগলাম। আবার রক্ত চলাচল শুরু হতেই তীব্র শিরশিরে একটা অনুভূতি টের পেলাম। কোন কিছু না ভেবেই ঘাড়

বাঁকিয়ে পেছনে তাকালাম। স্থির হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

এসব কি! জীবনে এমন জিনিস দেখা তো দূরের কথা নামও শুনিনি।

কি করে বর্ণনা দেব, বুঝতে পারছি না। স্লেজগাড়ির তলায় আটকানো লোহার পাত, মানে স্কেট, ওরকম দুটো বিশাল স্কেট জাতীয় জিনিসের মস্তবড় এক প্ল্যাটফর্ম। স্কেটের সামনেটা নাগড়া জুতোর শুঁড়ের মত ওপর দিকে বাঁকানো। প্ল্যাটফর্মের ওপর জাফরি দিয়ে তৈরি একটা পাইলন-ইস্পাতের কাঠামো, বারো থেকে পনেরো ফুট উঁচু। পাইলনের মাঝামাঝি জায়গায় দুই ব্লেডের প্রপেলার, তবে স্টীমারের চেয়ে অনেক বড়। মাথায় দুটো···দুটো···নাহ্, গুলিয়ে ফেলছি···হ্যাঁ, দুটো হাত···না, তাও না···তবে দুটো ডানা বলা যেতে পারে। বকের মত এক ঠ্যাঙের ওপর দাঁড়িয়ে দু'পাশে ছড়িয়ে ডানা মেলে দিয়েছে। আঠারো ফুট লম্বা ডানা দুটো ধাতুর তৈরি। চকচকে।

মোট দশটা একই ধরনের জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর কি কাজ, ধারণাই করতে পারলাম না।

ল্যাকোরকে দেখলাম। কিন্তু ফরাসী সেনাবাহিনীর পোশাক খুলে ফেলেছে। তার পরিবর্তে চমৎকার অন্য পোশাক পরেছে। কিন্তু এই ইউনিফর্ম কোন্ দেশের সেনাবাহিনী পরে, জানি না। কাঁধের ব্যাজ ক্যাপ্টেনের। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে লাগানো। দুই পাশে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে সেই দু'জন সার্জেন্ট। বিশজন নিগ্রো সৈন্যকেও দেখলাম। এদেরকে চিনি আমি। কিন্তু চিনি না আরও দশজন নতুন লোককে। সবাই শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায়, সব ক'টা ফাঁসীর আসামী। খুনী।

আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মিস ব্লেজনের মুখ। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। চোখ বন্ধ। স্থির। দুই পাশে বসে আছে ডক্টর চাতোন্নে আর মালিক। একনাগাড়ে কাঁদছে নিগ্রো মেয়েটা। ডাক্তার নাড়ী দেখছেন। ওদিকে ইঁটরঙা হয়ে গেছে সেন্ট বেরেনের টাক। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বয়েস বেড়ে গেছে যেন এক রাতেই।

তুলনামূলক ভাবে ভাল মঁসিয়ে বারজাক আর পঁসির চেহারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝাঁকাচ্ছেন বেদম। আড়ষ্টতা ভাঙছেন।

আশপাশে কোথাও কিন্তু টোনগানেকে দেখলাম না। মেরে ফেলেনি তো? ওর জন্যেই কি কাঁদছে আসলে মালিক? লোকটার জন্যে সত্যিই দুঃখ হলো। অনুমান করলাম, নেই যখন, মেরেই ফেলেছে টোনগানেকে খুনীগুলো।

পায়ের খিল এখনও পুরোপুরি ছাড়েনি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিস ব্লেজনের কাছে এগিয়ে গেলাম। কেউ বাধা দিল না।

কিন্তু পাশে পাশে হেঁটে গেল রুফুজ।

'মিস ব্লেজন কেমন আছেন এখন?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল রুফুজ।

'একটু ভাল এখন।' রুফুজের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন ডাক্তার।

'রওনা হওয়া যাবে?'

'আরও অন্তত ঘন্টাখানেক পরে। এভাবে বর্বর জানোয়ারের মত বয়ে নিতে গেলেন কেন? আমরা তো পালিয়ে যেতাম না।' ডাক্তারের গলায় ঝাঁঝ।

ভেবেছিলাম, খেপে গিয়ে অনর্থ ঘটাবে রুফুজ। কিন্তু কিছুই করল না। বরং ফিরে গেল নিজের সঙ্গীদের কাছে।

মিনিট পনেরো পরেই চোখ মেললেন মিস ব্লেজন। আগেই ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার।

চোখ মেলে চারদিকে একবার চাইলেন মিস ব্লেজন। তারপর আবার চোখ মুদলেন। খুললেন পাঁচ মিনিট পর। উঠে বসলেন। ব্যায়াম ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বারজাক আর পঁসি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন মিস ব্লেজন। বললেন, 'আমাকে মাপ করে দেবেন আপনারা। আমার, আমার জেদের জন্যেই···'

'আরে থাক, থাক,' বাধা দিলেন বারজাক, 'কাঁদছেন কেন? আর নিজেকে বা অত দোষ দিচ্ছেন কেন? আমরা তো আর কচি খোকা নই, যে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনবেন।'

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলাম ব্লেজনকে। এরপর এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়, ফিসফাস করে পরামর্শ করতে লাগলাম আমরা।

ওদিকে আবার সার্জেন্ট দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসছে রুফুজ।

আবার আমাদের বাঁধার আদেশ দিল শয়তান ক্যাপ্টেন। সর্বনাশ! আবার মাজেপ্পার হাল করে ছাড়বে না তো? তাহলেই গেছি।

এক এক করে সবাইকে বেঁধে ফেলা হলো। মিস ব্লেজনও বাদ গেলেন না। তারপর চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে আজব জিনিসগুলোর ভিতর ঢোকান হলো আমাদের। কিন্তু সবাইকে এক জায়গায় নয়, একেক জনকে একেকটার ভেতর।

ধাতব মেঝের ওপর দড়াম করে আছড়ে ফেলল আমাকে দুই ডাকাত। প্রচণ্ড জোরে নাক ঠুকে গেল মেঝেতে। ব্যথায় আঁধার হয়ে এল পৃথিবী।

প্রচণ্ড গর্জনে জ্ঞান ফিরে এল আমার। মৃদু দোলা অনুভব করলাম। জাহাজে চড়লে যেমন লাগে, অনেকটা তেমনি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম। ওদিকে ক্রমেই বাড়ছে গর্জন। এই গর্জনই শুনে এসেছি গত কয়েকদিন ধরে। কিম্ভূতকিমাকার জিনিসগুলো কোন ধরনের মেশিন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মনে হচ্ছে লিফটে করে প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠে যাচ্ছি। অদ্ভুত সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি হচ্ছে পেটের ভেতর। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুতগতিতে ট্রেন নামতে থাকলে আরোহীর যেমন লাগে, তেমনি, কিন্তু আরও বেশি তীব্র অনুভূতি। আরও ক'টা জিনিস টের পাচ্ছি। প্রচণ্ড যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে বাতাসের শাঁ শাঁ আওয়াজ।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে চলল কান, মন আর শরীরের ওপর বিচ্ছিরি অত্যাচার। তারপর সয়ে এল। যেন ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে শরীর। এমন কেন হচ্ছে?

বাইরে কি ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। হাত-পা বাঁধা। নইলে দেখার চেষ্টা করতাম।

চুপচাপ পড়ে রইলাম। এই সময় দুজন লোকের কথার শব্দ শুনলাম। অর্থাৎ এই আজব মেশিনে আমি একা নই।

লোক দুজনের একজন ইংরেজ। গলার স্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচুর মদ টেনেছে। অন্যজন নিগ্রো। ইংরেজি বলতে বলতে বামবারা ভাষায় কথা বলে উঠছে

মাঝে মাঝেই।

আর এভাবে ছাগলের মত পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না। হাতের বাঁধন টেনেটুনে পরীক্ষা করে দেখলাম। খুব একটা আঁটো মনে হলো না। আরও বার কয়েক জোরাজুরি করতেই অনেক খানি ঢিল হয়ে এল। বাঁধা হাত দুটো দাঁতের কাছে নিয়ে আসতে পারলাম।

প্রায় পনেরো মিনিটের চেষ্টায় খুলে ফেললাম বাঁধন। আরও পাঁচ মিনিট পড়ে থাকলাম চুপচাপ। তারপর সাবধানে হাত বাড়িয়ে বুটের ভেতরে লুকিয়ে রাখা চার ইঞ্চি ব্লেডের ছুরিটা বার করে আনলাম। শক্ত করে চেপে ধরলাম হাতের মুঠোয়।

এক ইঞ্চি করে ক্রল করে সামনে এগিয়ে চললাম। পৌঁছে গেলাম জাফরির কাছে। বাইরে উঁকি দিয়েই চমকে উঠলাম। থ হয়ে গেলাম একেবারে। স্বপ্ন দেখছি, না সত্যি!

শূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মেশিন। আমার পাঁচশো গজ নিচে মাটি। এক্সপ্রেস ট্রেনের অন্তত দশগুণ বেশি জোরে, হু হু করে ছুটছে আজব উড়ুক্কুযান। এতক্ষণে বুঝলাম, আঁধার রাতে মাথার উপরে আজব গর্জন কেন শোনা যেত। কেন অত চেষ্টা করেও দেখতে পেতাম না জিনিসটাকে। আসলে মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যেত তখন ফ্লাইং মেশিন।

শুধু যে অবাক হয়েছি তাই নয়, ভয়ে, আতঙ্কে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। এ কাদের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! পৃথিবী ছাড়িয়ে আমাকে অন্য কোন গ্রহে নিয়ে চলল নাকি ব্যাটারা? তাই হবে। নাহলে পৃথিবীতে ফ্লাইং মেশিন আবিষ্কৃত হয়েছে কই শুনিনি তো!

আবোল তাবোল ভাবছি, কিন্তু দৃষ্টি নিচেই আমার। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এখন জমির চেহারা। গাছপালা শেষ হয়ে গেছে কবেই, তৃণভূমিও পাতলা। দূরে মরুভূমি দেখা যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে মরুভূমির ওপর চলে এল ফ্লাইং মেশিন। দিগন্ত বিস্তৃত শুধু বালি আর বালি। কোথাও পাথর আর বালির পাহাড় উঠে গেছে যেন আকাশ ফুঁড়ে।

জাফরির ছোট ফাঁক দিয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে না।

কেটে গেল সময়। ঘড়ি দেখলাম, প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। দূরে একটা মরুদ্যান চোখে পড়েছে। গাছপালাও আছে।

মরুদ্যানটা কাছে আসতেই কিন্তু ফ্লাইং মেশিন দেখার চাইতে অবাক হয়ে গেলাম। নিচে বিশাল এক শহর। সাহারা মরুভূমিতে অত বড় শহর আছে, কস্মিনকালেও শুনিনি। আর অত আধুনিক শহরের কল্পনাও করতে পারেনি আমাদের চেনা পৃথিবী। এ যেন অন্তত একশো বছর ভবিষ্যতের পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।

বিশাল সব খুঁটি দেখে অনুমান করলাম টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার। আর বিরাট উঁচু উঁচু সব অ্যান্টেনা। কিসের কে জানে! বাওবাব, বাবলা, ক্যারাইট গাছের ছড়াছড়ি চারদিকে। বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলের গাছপালাও আছে প্রচুর। আর দেখলাম মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সব্জী আর গম খেত।

ফ্লাইং মেশিন আরও কয়েক মাইল উড়ে বিশাল প্রাচীর ডিঙিয়ে শহরে ঢুকে

পড়ল। আঁতকে উঠলাম। আকাশছোঁয়া সব অট্টালিকায় না আবার ধাক্কা খায় মেশিন। তাহলে গেছি।

চমৎকার শহর। আধখানা চাঁদের মত। দূর থেকে অতটা বোঝা যায়নি। এখন শহরের ওপর এসে দেখেশুনে আরও তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।

শহরে লোকজন কিন্তু তেমন নেই। একআধজন পথচারী শুধু ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। যেন কাজের অনেক তাড়া। তবে খেতে খামারে শত শত লোককে কাজ করতে দেখে এসেছি।

একটা নদী পেরিয়ে এলাম। টিলার চূড়ায় শহরের সবচেয়ে বড় আর আধুনিক প্রাসাদের মাথায় এসে থামল ফ্লাইং মেশিন। প্রাসাদের পাশে বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন লোক। আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল মেশিন। দেখতে দেখতে নেমে পড়ল চত্বরে। কিন্তু থামল না। প্রচণ্ড বেগে ঘসটে ঘসটে ছুটে গেল সামনে। সেরেছে রে! বিকল হয়ে গেছে বুঝি মেশিন। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

কিন্তু খামোকাই ভয় পেয়েছি। আস্তে আস্তে থেমে দাঁড়াল মেশিন। এঞ্জিনের শব্দও কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল।

মাঝখানের দরজা খুলে আমার কেবিনে এসে ঢুকল একজন শ্বেতাঙ্গ। আমাকে হাতখোলা অবস্থায় জাফরির কাছে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এই ব্যাটা দেখছি সব দেখছে! অত ঢিলে করে বেঁধেছে কে?'

কিছু বললাম না।

এগিয়ে এসে আমাকে ঠ্যাঙ ধরে হিড় হিড় করে মাঝে টেনে নিয়ে এল লোকটা। পায়ের বাঁধন খুলল। তারপর কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিল, 'ওঠো।'

উঠতে গিয়েও পড়ে গেলাম। আসলে হাত যাই হোক, পায়ে ঠিকই কষে বেঁধেছিল হতচ্ছাড়ারা। এখন হঠাৎ বাঁধন মুক্ত হতেই রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে, অথচ বোধশক্তি তেমন আসেনি পায়ে।

একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে উঠলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। কিন্তু ওপাশের কিছু দেখা গেল না। চোখের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক প্রাচীর। একপাশে তাকিয়ে আকাশছোঁয়া এক পাইলন চোখে পড়ল। এ ধরনের আজব পাইলনের কি দরকার বুঝলাম না।

ডানের দৃশ্য কিন্তু অন্যরকম। অপরূপ সুন্দর এক প্রাসাদ। আকাশ থেকে এটাই দেখেছিলাম। রাজার বাড়ি নাকি? ফ্রান্সের মস্ত মস্ত ধনীরাও অমন বাড়ি বানাবার কল্পনাও করতে পারবে না।

ধাক্কা দিয়ে আমাকে বাইরে বেরোবার নির্দেশ দিল শ্বেতাঙ্গ লোকটা। বেরিয়ে এলাম।

একে একে আরও কয়েকটা আকাশযান থেকে নেমে এল আমার সঙ্গীরা। কিন্তু মালিক আর টোনগানে অনুপস্থিত। ব্যাপার কি? ফ্লাইং মেশিনে চড়ার আগেও তো মেয়েটাকে দেখেছি! ও, বুঝেছি। টোনগানেকে তো আগেই শেষ করে দিয়েছে। আসার আগে বোধহয় মেয়েটারও পেট ফেঁড়ে রেখে এসেছে নরপিশাচগুলো।

সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, অসম্ভব রকম অবাক হয়ে গেছে

সবাই। মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করলাম এত বিপদের মাঝেও। আসলে বিস্ময়ে থ' হয়ে গেছে ওরা। বুঝতে পারছে না, কিসে চড়ে কোথায় এসেছে। আসলে ওরা তো আর আমার মত বাঁধন খুলতে পারেনি, দেখেওনি কিছু। তাই জানতেও পারেনি, উড়ে এসেছি আমরা অতটা পথ। নিজের চোখে না দেখলে, আমিও বুঝতে পারতাম না ব্যাপারটা। ওদেরই মত অবাক হতাম।

সামনে চলার নির্দেশ পেলাম।

একবার ফিরে চেয়েই এগিয়ে চললাম।

কি আর করা!

তিন

(আমিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে)

২৬ মার্চ। কয়েদখানায় বসে লিখছি। মাজেপ্পার পর এখন সিলভিও পেলিকোর অবস্থায় পড়েছি। গুপ্ত সমিতির কারবোনারির সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে দশ বছর জেল হয়েছিল যার। এবং এর কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন লর্ড বায়রনের এক ইটালিয়ান নাট্যকার বন্ধু। কিন্তু আমার জেল হলো কি অপরাধে বুঝতে পারছি না। আর আমার কাহিনীই বা লিখবে কে? তাই নিজের নাটক নিজেই লেখার চেষ্টা করছি।

ফ্লাইং মেশিন থেকে নামানোর পরে আমাদের ঘাড় ধরে এনে এই কয়েদখানায় রেখে গেছে তিনজন মুলাটো, মানে শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রোর দোআঁশলা আর কি। অনেক সিঁড়ি, অনেক অন্ধকার গলিপথ পার করিয়ে নিয়ে এসেছে একটা লম্বা গ্যালারিতে। এর দু'পাশে সারি সারি কারাকক্ষ। এরই একটিতে ভরে রাখা হয়েছে আমাকে। কয়েদখানার দরজা তো বন্ধ করেছেই, বাইরে থেকে পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী গার্ড।

কয়েদখানা ঘরটায় মাত্র একটাই জানালা। তাও বারো ফুট উঁচুতে। মজবুত গরাদ লাগানো।

একলা ঘরে বসে আছি আমি। ঘরে আসবাব বলতে একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা চারপায়া। তাতে খড় বিছিয়ে ওপরে বাজে একটা চাদর পেতে রাখা হয়েছে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে ইলেকট্রিক আলো।

ভাগ্যিস ডাকাতেরা আমার নোটবই আর কলম কেড়ে নেয়নি। লিখতে পেরে খানিকটা হলেও সময় কাটাতে পারছি।

বসে বসে ভাবছি, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে চাইলাম। লোকটাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠল।

চৌমৌকি!

বিশ্বাসঘাতকটাকে দেখেই রক্ত চড়ে গেল মাথায়। কোন ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই লাফিয়ে উঠে তাড়া করলাম ব্যাটাকে। দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ

করে দিল সে।

চেয়ারে ফিরে এসে বসে বসে ফুলতে লাগলাম। আস্তে আস্তে রাগ কমে আসতেই তলিয়ে ভাবতে পারলাম আবার। নতুন বুদ্ধি ঢুকল মাথায়। তাই তো, চৌমৌকির ওপর রাগ দেখিয়ে এখন আর কোন লাভ নেই। ওর কিছু করতে পারব না আমি এখন। তার চেয়ে বরং ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে খবরাখবর নেয়া উচিত।

আমার মনের কথা শুনতে পেয়েই যেন আবার দরজা খুলল চৌমৌকি। কিন্তু একবারে নয়। সামান্য একটু ফাঁক করল পাল্লা। উঁকি দিল। কিন্তু আমি নড়লাম না।

সাহস পেয়ে দরজা আর একটু ফাঁক করল চৌমৌকি। তবু নড়লাম না। দেখে কবাট দুটো পুরোই ফাঁক করল সে এবার।

'কেন এসেছ?' প্রথম চোটেই ভাব না দেখিয়ে একটু রাগতঃস্বরে বললাম।

'আপনার খাবার,' ভয়ে ভয়ে বলল চৌমৌকি।

'ভেতরে এসো।' ডাকলাম।

এল চৌমৌকি। কিন্তু আবার আমি তাড়া করলেই ছুটে পালাবার জন্যে প্রস্তুত।

আমি কিছুই করলাম না দেখে এগিয়ে এসে সামনের টেবিলে খাবার জন্যে ট্রে-টা সাজিয়ে রাখল চৌমৌকি।

দারুণ খিদে পেয়েছে। তাই কোনদিকে না তাকিয়ে খাওয়া শুরু করলাম। একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চৌমৌকি।

খেতে খেতেই জানলাম, হ্যারি কিলার নামে এক দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজার বন্দী হয়েছি আমরা। ব্ল্যাকল্যান্ড শহরের কথাও অনেক কিছুই শুনলাম। একটা কথাও অবিশ্বাস করলাম না। কারণ ফ্লাইং মেশিনে তো চড়েই এসেছি আমরা। যার এ ধরনের যান তৈরির ক্ষমতা থাকে, সে আরও অনেক কিছুই করতে পারে।

বারজাক মিশন অভিযানে রওনা দেয়ার আগে কায়দা করে মিস ব্লেজনের কাজে চৌমৌকিকে নিযুক্ত করিয়েছে হ্যারি কিলার। আগেই খবর পেয়েছে সে, মিশনটা তার শহরের কাছাকাছিই আসবে। যদি কোনক্রমে ব্ল্যাকল্যান্ডের খোঁজ পেয়ে যায় অভিযাত্রীরা, তাই এই হুঁশিয়ারি। কিন্তু কেন? আমরা ব্ল্যাকল্যান্ডের কথা জেনে ফিরে গেলে হ্যারি কিলারের ক্ষতি কি?

হ্যারি কিলারেরই লোক মোরিলিরে। তাকে দিয়েই চৌমৌকির সঙ্গে ভাব জমায় কিলার। পক্ষ বদলাবার জন্যে অবশ্য অনেক সোনার মোহর দেয়া হয়েছে চৌমৌকিকে।

পক্ষ বদলিয়েছে ঠিকই, চৌমৌকি জানাল, কিন্তু এখনও মিস ব্লেজনের প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা কমেনি নাকি তার।

টোনগানের কথা জিজ্ঞেস করতেই কিন্তু মুখ কালো করে ফেলল চৌমৌকি। উসখুস করতে করতে বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। যেতে হবে আবার আমাকে। বেশি দেরি করলে মেরে ফেলবে।'

কে মেরে ফেলবে জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলাম না। টোনগানের ব্যাপারেও যা অনুমান করেছিলাম, ঠিকই। মেরেই ফেলা হয়েছে ওকে।

আরও জানলাম ফ্লাইং মেশিনে চড়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ক্যাপ্টেন রুফুজ। তাই তো বলি শত শত মাইল দুর্গম জায়গা ঘোড়ায় চড়ে পেরিয়ে গিয়ে কি করে লোকের জামা-কাপড়-চেহারা অত ফিটফাট থাকে?

সার্জেন্ট দু'জন কিন্তু বারোজন নিগ্রো সৈনিককে নিয়ে ঘোড়ায় চড়েই গিয়েছে। তাই ওদের জামাকাপড় অত নোংরা আর ছেঁড়া-খোঁড়া ছিল। যাবার পথে মাঝে মধ্যে নিছক মজা করার জন্যে গ্রাম লুট করেছে, আর খুন করেছে নিরপরাধ লোকগুলোকে। তাই কাঁধে মারাত্মক আঘাত পাওয়া নিগ্রোটা দু'জনকে দেখে অমন আঁতকে উঠেছিল।

ফ্লাইং মেশিনে চড়েই ব্ল্যাকল্যান্ডে ফিরে এসেছে চৌমৌকি আর মোরিলিরে। মনে পড়ল, ওরা পালানোর রাতে অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছিলাম।

প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই শুনলাম। ইচ্ছে করেই ভাব জমালাম চৌমৌকির সঙ্গে। প্রচুর টাকার লোভ দেখালাম। এখান থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যেতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু দারুণভাবে মাথা নেড়ে বলল চৌমৌকি, 'তা সম্ভব নয়, মঁসিয়ে। একবার বন্দী হলে কেউ বেরোতে পারে না এখান থেকে। দেয়ালের পর উঁচু দেয়াল যদি কেউ পেরোতে পারেন, যদিও তা অসম্ভব, বন্দুকধারী পাহারাদারের চোখে ফাঁকি দিতে পারবেন না কিছুতেই। হয়তো বা নেহায়েত কপালগুণে ফাঁকি দিলেনই ওদের, কিন্তু মরুভূমি? ওটা পেরোবেন কি করে? কাজেই পালাবার আশা ছেড়ে দিন।'

খাওয়া শেষ হলো। এঁটো বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল চৌমৌকি।

আগের চেয়ে বেড়ে গেছে দুশ্চিন্তা। তবে কি সারাটা জীবন এই কারাগারে হ্যারি কিলারের বন্দী হয়েই কাটাতে হবে?

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। করার আর আছেই বা কি? বদ্ধ কারাগারে শুয়ে বসেই তো কাটাতে হবে।

২৬ মার্চ, সন্ধ্যা। হিজ ম্যাজেস্টি দুর্ধর্ষ হ্যারি কিলারকে দেখার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য হয়েছে। শুয়ে ছিলাম। হয়তো একটু তন্দ্রামত এসেছিল। দরজা খোলার শব্দে চোখ খুলে ফিরে চাইলাম। না, এবারে চৌমৌকি নয়। শয়তান মোরিলিরে। আমাকে বাইরে বেরোনোর ইশারা করল জানোয়ারটা।

বেরোলাম। দেখি সেই বিশজন নিগ্রো সৈনিকও আছে। মোরিলিরেকেই তাদের সর্দার বলে মনে হলো।

আমার সঙ্গীসাথীদের ঘিরে দাঁড়িয়ে সৈনিকেরা। সবাই আছে সেন্ট বেরেন ছাড়া। বাতে কাবু হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই ভদ্রলোক।

সার বেঁধে মার্চ করিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। অনেক সিঁড়ি অনেক গলিপথ পেরিয়ে এক বিশাল ঘরে এসে পৌছলাম। আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দলবল নিয়ে বাইরেই রইল মোরিলিরে।

বিশাল ঘরে আসবাব বলতে মাত্র একটা চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা টুল। টুলে রাখা একটা অর্ধেক ভরা মদের বোতল। পাশে গেলাস। বাতাসে মদের

তীব্র গন্ধ।

টেবিলের ওপাশে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা পিশাচ। নররূপী। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া জটা দেখলে মনে হয় আলগা এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। জুলফির কাছে একটা রোমও নেই। ঢ্যাঙা। বিশাল শরীর। ফুলে ফুলে আছে পেশী। গায়ে অমানুষিক শক্তি ধরে দানবটা, একনজরেই বোঝা যায়।

ঝাঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। উন্নত কপাল—তীক্ষ্ণশক্তির লক্ষণ। হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়াল সাংঘাতিক উগ্র প্রকৃতি প্রকাশ করছে। ব্রোঞ্জ রঙের হনুর নিচে ভেঙে তুবড়ে বসা গাল। গালের আধ ইঞ্চি নিচে দলা হয়ে ঝুলছে চামড়া। তাতে ফুটকি ফুটকি লাল ব্রণ। ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। বিচ্ছিরি রকম মোটা ঠোঁট, বিশেষ করে নিচেরটা। ওজন সামলাতে না পেরে ঝুলে আছে। হলদেটে নোংরা দাঁতের সারির দিকে চাইলে পাকস্থলী মোচড় দিয়ে বমি বেরিয়ে আসতে চায়। খোঁচা খোঁচা পাপড়ি। চোখ জোড়া কোটরে বসা। নীলচে রঙ। কিন্তু মনে হয় নীল আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে। চাওয়া যায় না।

আপাদমস্তক এত শ্রীহীনতা আর বীভৎসতা এর আগে কোন মানুষের মাঝে দেখিনি। হতে যে পারে, তাও কল্পনা করিনি কোনকালে। কদাকার, ভয়াবহ লোকটার শরীরের অণুতে-পরমাণুতে মহাপাপ যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে।

প্রচণ্ড দাম্ভিক দৃষ্টি দেখে কাউকে বলে দিতে হলো না, এই-ই হিজ ম্যাজেস্টি হ্যারি কিলার।

ধূসর হান্টিং পোশাক পরে আছে হ্যারি কিলার। টেবিলে ফেলে রেখেছে একটা উলের হ্যাট। হ্যাটের পাশে রাখা ডান হাতটা কাঁপছে। বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে।

আমাদের দেখেও একেবারে নির্বাক রইল হ্যারি কিলার কিছুক্ষণ। পিচ্ছিল চোখের দৃষ্টি দিয়ে বার বার দেখল আমাদের আপাদমস্তক। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলাম আমরা। যেন দয়া করে মহাবাণী শোনাবেন আমাদের দেবতা।

মুখ খুলল অবশেষে হ্যারি কিলার। খ্যাড়খ্যাড়ে গলায় ফরাসীতেই কথা বলল সে, 'ছ'জন না ছিলেন? তাই তো শুনেছি। কিন্তু এখন যে দেখছি পাঁচ?'

'অবস্থা কাহিল একজনের। অবশ্যই আপনাদের অত্যাচারে।' সোজাসাপ্টা জবাব দিলেন ডক্টর চাতোন্নে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আচমকা প্রশ্ন, 'কি মতলবে আমার দেশে?'

রক্ত জমাট করা থমথমে পরিবেশেও হাসি পেল। কিন্তু হাসলাম না। জবাব দিলাম না কেউ।

'স্পাইগিরি করতে? না?' জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ধমকে উঠল হ্যারি কিলার।

'দেখুন মঁসিয়ে, মাপ করবেন···' শুরু করলেন বারজাক।

কিন্তু এক ধমকে তাঁকে থামিয়ে দিল হ্যারি কিলার। দড়াম করে কিল মারল টেবিলে। চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার! মঁসিয়ে নয়, মাস্টার বলবেন। এখানে সবাই তাই বলে আমাকে।'

খেপে গেলেন বারজাক। কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। বুক ফুলিয়ে বললেন, 'সতেরোশো উননব্বই সালের পর থেকে কাউকে আর মাস্টার ডাকে না ফরাসীরা।'

বারজাকের নাটকীয়তা দেখে অন্য সময় হলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। কিন্তু হ্যারি কিলার নামক জানোয়ারটার সামনে হাসলাম না। কখন আবার পান থেকে চুন খসলেই প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে বসে। বারজাকের কথায় বিচলিত হয়ে উঠলাম। অথচ লেজ জুড়লেন পঁসি, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে?'

ভেবেছিলাম, সাংঘাতিক খেপে গিয়ে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবে হ্যারি কিলার। কিন্তু শ্রাগ করে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে। বুঝে গেছে, দাবড়ানিতে কাজ হবে না।

চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগল দানবটা, নাকি মদের নেশায় ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে। হঠাৎই আবার চোখ খুলল সে। যেন আমাদের এই প্রথম দেখছে, এমনিভাবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবার দৃষ্টি বুলিয়ে চলল। সবার ওপরে কয়েক দফা বুলিয়ে এসে দৃষ্টিটা থেমে গেল বারজাকের ওপর। চোখের দৃষ্টি পাল্টে যাচ্ছে। তীব্র হচ্ছে নীল আগুনের শিখা। শিউরে উঠলাম। কিন্তু সামান্যতম বিচলিত হলেন না বারজাক। এতদিনে বুঝলাম, কেন সাফল্যের শিখরে উঠতে পেরেছেন তিনি। এই না হলে পাবলিক লীডার?

আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল হ্যারি কিলার, 'ইংরেজি জানা আছে?'

'ক্যাম্ব্রিজ স্ট্যান্ডার্ড। চলবে এতে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বারজাক।

'সবাই বোঝে?'

'বোঝা তো উচিত। আমার সঙ্গী যখন।' বাঁকা উত্তরই দিলেন বারজাক।

'তা হলেই ভাল। ফরাসী বলতে ঘেন্না হয় আমার।' মদের নেশায় জড়িত গলায় টেনে টেনে ইংরেজিতে বলল এবার হ্যারি কিলার।

'ভাষার প্রতি ঘৃণা থাকা বদ লোকের লক্ষণ।' শান্ত গলায় বললেন বারজাক।

'চো-ও-প!' ঘর কাঁপিয়ে ধমকে উঠল হ্যারি কিলার। তারপর স্বর নামিয়ে বলল, 'তা এখানে আসার মতলবটা কি?'

'আমরাই বরং করতে চাই প্রশ্নটা। কি কারণে ধরে আনা হয়েছে আমাদের?'

'চালাকিটা ধরে ফেলেছি বলে। আমার সাম্রাজ্যের আশপাশে বিদেশী কারোর ঘুর ঘুর পছন্দ করি না আমি।'

সাম্রাজ্য! বলে কি লোকটা! কিন্তু কিছু বললেন না বারজাক। আমরাও চুপ থাকলাম।

আমাদের এই নীরবতা পছন্দ হলো না হ্যারি কিলারের। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। প্রচণ্ড জোরে জোরে টেবিলে গোটা তিনেক কিল মেরে বলল, 'হ্যাঁ, পছন্দ করি না। ভেবেছেন, আপনাদের মতলব আমি কিচ্ছু টের পাইনি? টিম্বাকটু থেকে নাইজারে অহরহ লোক পাঠাচ্ছে ফরাসীরা। চুপচাপ দেখে গেছি শুধু আমি, কিছু বলিনি। কিন্তু আমার রাজ্যে স্পাই পাঠানোর পরও চুপ করে থাকব? না, কিছুতেই না। জানেন, কাঁচের এই গেলাসের মত আছড়ে ভাঙতে পারি আমি আপনাদের?'

হাতের গেলাসটা গায়ের জোরে মেঝেতে আছাড় মারল হ্যারি কিলার। ঝনঝন করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল জিনিসটা।

'আর একটা গেলাস! জলদি!' পাশের দরজার দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল হ্যারি কিলার।

কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে দানবটার। পশুর চাইতেও অধম করে তুলেছে ওকে উন্মত্ত ক্রোধ। পরিবর্তিত হয়ে নীলচে-লাল হয়ে গেছে চোখের রঙ।

পড়িমরি করে গেলাস নিয়ে ঢুকল নিগ্রো পরিচারক। ফিরেও তাকাল না হ্যারি কিলার। ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন এমনিভাবে দমাদম কিলঘুসি মারতে লাগল টেবিলে। হঠাৎই থেমে গিয়ে বারজাকের অবিচল মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলে চলল, 'বারবার হুঁশিয়ার করেছি আপনাদের, কিন্তু পাত্তা দেননি আপনারা। ডোঔং-কোন বিশেষ ব্যাপার কায়দা করে আপনাদের জানিয়েছিলাম আমিই। আমার ফার্স্ট ওয়ার্নিং। মানেননি আপনারা। ওঝাকে শিখিয়ে পড়িয়ে, আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী শোনালাম। শুধু আপনাদের দোষেই তার কথা সত্যি হলো। শেষ পর্যন্ত কি আর করি? কায়দা করে ক্যাপ্টেন মারসিনেকে সরিয়ে দিলাম। তার বদলে আমার ক্যাপ্টেন রুফুজকে ঢুকিয়ে দিলাম আপনাদের দলে। সময় বুঝে দুর্গম জায়গায় আপনাদের ত্যাগ করল রুফুজ। কিন্তু তবু টনক নড়ল না আপনাদের। ফিরে গেলেন না। না খাইয়ে রাখলাম। তবু কেয়ার করলেন না। একটু একটু করে ঢুকেই চললেন নাইজারে। কিছু বলার আছে?'

কিছুই বললাম না। ঘরময় দাপাদাপি লাফালাফি করে বেড়াল হ্যারি কিলার। প্রচণ্ড রাগে।

হঠাৎই দাঁড়িয়ে গেল এক জায়গায়। আশ্চর্য শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সায়ে যাচ্ছিলেন আপনারা, না?'

'যাচ্ছিলাম।' উত্তর দিলেন বারজাক।

'হঠাৎ উল্টোদিকে ফিরলেন কেন তাহলে? মানে কৌবোতে গেলেন কেন?'

বারজাককে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে চাইছে যেন দৃষ্টি দিয়ে হ্যারি কিলার।

'কারণ টিম্বাকটু যাচ্ছিলাম।' একটুও দ্বিধা না করে জবাব দিলেন বারজাক।

'সিকাসো তো আরও কাছে। সেখানে যাননি কেন?'

'টিম্বাকটু গেলেই বেশি সুবিধে হত আমাদের।'

'হুঁমম!' কিছুতেই সন্দেহ যেতে চাইছে না হ্যারি কিলারের। 'তাহলে নাইজারের পুবে যাবার মতলব ছিল না? ঠিক বলছেন?'

'মিছে বলার অভ্যেস নেই।'

'আগে জানলে এখান পর্যন্ত আসার কষ্ট করতে হত না আপনাদের।'

লোকটার ধৃষ্টতায় গা জ্বলে গেল আমার।

আর কথা না বলে থাকতে পারলাম না। শান্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কৌতূহল মেটাবেন? এখানে আমাদের বয়ে আনার কষ্ট করতে গেলেন কেন? খতম করে দিলেই হত।'

'তা হত। কিন্তু ফরাসী সরকারের টনক নড়ত তাহলে।'

'এখনও তো নড়বে?'

'আনতে তো চাইনি সেজন্যেই। ফিরিয়েই তো দিতে চেয়েছিলাম।'

'এখনও তা করা যায়। মানে যেখান থেকে ধরে এনেছেন…'

'হ্যাঁ দেশে গিয়ে খবরটা ছড়ান। আজব এক নগর দেখে এসেছি সাহারায়। না, না, তা হবে না। ব্ল্যাকল্যান্ডে একবার ঢুকলে জ্যান্ত বেরোতে পারে না কেউ।

আমার রাজ্যের খবর জানে না বাইরের দুনিয়া, জানবেও না কোনদিন।'

'কিন্তু আমরা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছি শুনলে তদন্ত কমিশন আসবেই।'

'আসুক। মরবে।' একটু থেমে বলল হ্যারি কিলার, 'কিন্তু এসে যখন পড়েছেন অন্যভাবেও কাজ হাসিল করতে পারব আমি।'

'যেমন?'

'জামিন থাকছেন আপনারা। ফরাসী সরকার বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাইলে বলব, তার দেশের কয়েকজন অতি গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার আয়ত্তাধীনে আছে।'

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, আমাদের শেষ করে ফেলার আপাতত কোন ইচ্ছে নেই হ্যারি কিলারের।

আবার গিয়ে চেয়ারে বসল হিজ ম্যাজেস্টি। খামোকাই রাগে ফুঁসছে, কয়েক সেকেন্ডেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কথা বলল আবার হ্যারি, 'এসে যখন পড়েছেন, রাজ্যের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। আমারই মত স্বচ্ছন্দে। কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।'

রাজ্য শব্দটার ইমেজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল নরকের শয়তানের মুখ থেকে বেরিয়ে।

'কিন্তু এর বিনিময়ে অবশ্যই জামিনে থাকতে রাজি হতে হবে আপনাদের।' একটু থেমে বলল হ্যারি কিলার, 'কিংবা···'

'কিংবা?' প্রশ্ন করলেন বারজাক।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল হ্যারি। 'আমার সহযোগী হয়ে যান।'

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হারামজাদা শয়তানটা একথা ভাবতে পারল কি করে? বলেই চলল হ্যারি কিলার। ঠাণ্ডা শীতল স্বর। 'আমার রাজ্যের সন্ধান একদিন না একদিন পাবেই ফরাসী সরকার। সৈন্য পাঠাবে। আমার সঙ্গে যুদ্ধে হারবে তারা। খামোকা এই খুনোখুনি করে লাভ কি? আমি আমার রাজ্য নিয়ে আছি। কি করে আরও বেশি করে ফসল ফলানো যায় মরুভূমিতে, চেষ্টা করছি। আর নাইজারে কলোনি স্থাপনের তালে আছে ফরাসী সরকার। থাকুক। দু'জনের কারও ব্যাপারেই আমরা কেউ মাথা ঘামাব না। দুই দেশের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব চুক্তি স্থাপিত হতে পারে। শুধু ঠিকমত আলোচনা চালানো দরকার।'

'আপনার সঙ্গে?' বারজাকের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

ফেটে পড়ল হ্যারি কিলার। কোনরকম জানান না দিয়েই যেন আচমকা ফেটে পড়ল আগ্নেয়গিরির চূড়া, 'তাচ্ছিল্য, অ্যাঁ?' ঘর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। তারপরই আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল, 'ঠিক আছে, কিছু নমুনা দেখাচ্ছি। কথা বলতে এরপর থেকে সাবধানে বলবেন।'

বাইরের প্রহরীদের ডাকল হ্যারি কিলার।

আবার অনেক সিঁড়ি, গলিপথ, ছোট ছোট ছাদ ইত্যাদি পেরিয়ে এক বিশাল ছাদের ওপর এনে হাজির করা হলো আমাদের। আগেই পৌঁছে গেছে হ্যারি কিলার। দেখে মনে হয়, তার চেয়ে ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক আর হয় না।

প্রহরীদের চলে যেতে বলে আমাদের দিকে ফিরল হ্যারি কিলার, 'মাত্র একশো

বিশ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা। দিগন্ত এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে। দেখতেই পাচ্ছেন, শহর আর দিগন্তের মাঝের জায়গায় ফসল ফলছে। অথচ এককালে শুধু বালির সাগর ছিল এখানে। সব মিলিয়ে আমার রাজ্যের ক্ষেত্রফল বারোশো বর্গমাইল। এই এলাকার মধ্যে বাইরের কেউ পা দিলেই তিন সারি গার্ড-পোস্ট থেকে খবর আসবে আমার কাছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।'

খামোকাই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করল হ্যারি কিলার। তারপর আবার বলে চলল, 'খবর পাওয়ার পরে সাথে সাথেই কিছু বলব না আমি। এগিয়ে আসতে থাকুক হয়তো অনুপ্রবেশকারী। ব্ল্যাকল্যান্ডের পাঁচিলের পাঁচ ফার্লং দূরের আধমাইল জায়গা পেরোতে পারবে না সে কিছুতেই। থেমে যেতে হবে। কারণ বাধা দেয়া হবে তাকে। ওকে দেখবে কি করে আমার লোকেরা জানেন?'

ছাদের মাঝামাঝি এক জায়গায় লাইটহাউসের মত দেখতে, কিন্তু আরও অনেক বেশি উঁচু একটা মিনারের দিকে ইঙ্গিত করল হ্যারি কিলার। বলল, 'ওখান থেকে জোরাল প্রোজেক্টরের আলো ফেলা হয় রাতের বেলা। দিন হয়ে থাকে তখন শহরের বাইরের পাঁচ ফার্লং দূরের ওই আধমাইল জায়গা, শহরকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে। আর ওই অঞ্চলের দিকে নজর রাখা হয় টেলিস্কোপের একটা অকল্পনীয় উন্নত সংস্করণ, সাইক্লোসকোপের সাহায্যে। আসুন, যন্ত্রটা দেখাই আপনাদের, নইলে ক্ষমতা বুঝতে পারবেন না।'

হ্যারি কিলারের পিছু পিছু গিয়ে ওই বিশাল মিনারের চূড়ায় উঠলাম। একটা দরজা ঠেলে চূড়ার ঘরটার ভেতরে ঢুকল হ্যারি। আমরাও ঢুকলাম তার পিছু পিছু। আশ্চর্য! ঢুকে ঘরের বৃত্তাকার দেয়ালের দিকে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বাইরের পৃথিবী। আসলে ঘরের দেয়ালটা একটা অদ্ভুত লেন্স।

একটা উঁচু বিরাট পাঁচিল দেখতে পেলাম লেন্সের মধ্যে দিয়ে। পাঁচিলের ওপর কালো লাইন টেনে ভাগ করা অনেকগুলো আলাদা আলাদা চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র। পাঁচিলের মাথা থেকে শুরু হয়েছে মেঘের রাজত্ব। পাঁচিলের বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অগণিত দাগ, অসংখ্য ছায়া আর আবছা নকশা। কিছু কিছু দাগ আর ছায়া আবার নড়ছে। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! আর একটু খুঁটিয়ে দেখেই বুঝে গেলাম ব্যাপারটা। আসলে পাঁচিল নয় ওটা। অদ্ভুত লেন্সের মধ্যে দিয়ে পুরো ফসলের খেতটাকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে বলে অমন মনে হচ্ছে। চতুষ্কোণ দাগগুলো আসলে ভাগ ভাগ করা খেত। ফুটকি আর দাগগুলোর কোনটা মানুষ কোনটা গাছ, কোনটা চাষের যন্ত্র। আর পাঁচিলের ওপরের মেঘ হলো খেতের ওপারের মরুভূমি।

অনেক দূরে দুটো দাগ দেখাল হ্যারি কিলার। নড়ছে ওদুটো।

'দু'জন নিগ্রো।' বলল হ্যারি কিলার, 'ধরুন, পালাচ্ছে ওরা। কিন্তু বেশিদূর যাওয়ার ক্ষমতা ওদের নেই।' ঘরের মাঝখানে বসানো রেডিও টেলিফোনের রিসিভার তুলল হ্যারি কিলার। বলল, 'একশো এগারো নম্বর সার্কেল। ব্যাসার্ধ, পনেরোশো আটাশ।'

আরেকটা রিসিভার তুলে বলল, 'চোদ্দ নম্বর সার্কেল। ব্যাসার্ধ পনেরোশো দুই।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আমাদের দিকে ফিরল হ্যারি কিলার। বলল, 'দারুণ

একটা খেলা দেখবেন এখন।'

কয়েক মিনিট কিছুই ঘটল না। তারপরই একটা দাগের ওপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল। ধোঁয়া মিলিয়ে যেতেই আর দেখা গেল না দাগটাকে।

গলা কেঁপে উঠল মিস ব্রেজনের, 'গেল কোথায় লোকটা?'

'জাহান্নামে।' শান্ত গলা হ্যারি কিলারের।

'অ্যাঁ!' একসঙ্গেই বলে উঠলাম সবাই, 'খামোকা মেরে ফেললেন লোকটাকে? কি দোষ করেছিল?'

'মেরেই ফেললাম।' বিন্দুমাত্র কাঁপল না হ্যারি কিলারের গলা, 'কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ও ব্যাটা তো নিগ্রো। একটা গেলে অমন দশটা আসবে। শুধু আমি চাইলেই হলো। কিন্তু আমার স্কাই টর্পেডোর খেলাটা কেমন দেখলেন বলুন? পনেরো মাইল রেঞ্জ। অব্যর্থ লক্ষ্য, এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হবে না। ভয়ঙ্কর স্পীড। আশা করি এ পথে পালাতে চাইবেন না?'

বিহ্বল ভাবে দ্বিতীয় দাগটার দিকে চেয়ে রইলাম। এই হতভাগ্য লোকটার ভাগ্যে আবার কি আছে, কে জানে!

লেন্সের ভেতর দিয়ে আচমকাই দেখলাম বস্তুটাকে। কিন্তু কি, বুঝতে পারলাম না। তীব্রবেগে ধেয়ে গেল দ্বিতীয় দাগটার দিকে। কয়েক সেকেন্ড পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল দাগটা।

'মেরে ফেললেন এই লোকটাকেও?' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন মিস ব্রেজন।

'আরে না, না। এখুনি দেখবেন ওকে। চলুন বাইরে চলুন।'

আমাদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল হ্যারি কিলার। লিফটে চড়ে নিচে নেমে এলাম। বেরিয়ে এলাম বিশাল ছাদের মত প্ল্যাটফর্মে। আঙুল তুলে আকাশের এক দিকে দেখাল আমাদের হ্যারি। চাইলাম। প্রচণ্ড গতিতে এদিকেই উড়ে আসছে একটা ফ্লাইং মেশিন। কি যেন ঝুলছে মেশিনটার তলায়।

'ওটা হেলিপ্লেন।' এই প্রথম ফ্লাইং মেশিনের নাম শুনলাম হ্যারি কিলারের মুখে।

দেখতে দেখতে কাছে চলে এল হেলিপ্লেন। তলার ঝুলন্ত জিনিসটা চিনতে পেরে শিউরে উঠলাম। অতিকায় চিমটের মাঝে ধরা মানুষটা ছটফট করছে। একজন নিগ্রো।

মাথার ওপরে চলে এল হেলিপ্লেন। প্ল্যাটফর্মের ওপর এসে আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল মেশিনটা। ধীরে ধীরে খুলে গেল চিমটের দাঁড়া। প্রায় দুশো ফুট ওপর থেকে কঠিন পাথরের প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়ল হতভাগ্য নিগ্রোটা। টাশ্‌শ করে তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। খুলি ফেটে গেছে লোকটার। ছিটকে এসে আমাদের নাকে মুখে লাগল তাজা রক্ত মেশানো ঘিলু।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন মিস ব্রেজন। তারপরই হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরলেন হ্যারি কিলারের। রুদ্ধস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, 'খুনে···শয়তান···নরপিশাচ!'

অনায়াসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হ্যারি কিলার। ভোজবাজির মত প্ল্যাটফর্মে

এসে হাজির হলো একদল নিগ্রো গার্ড। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল আমাদের। মিস ব্লেজনের দু'হাত চেপে ধরল দুইজন ভীষণদর্শন গার্ড।

আতঙ্কে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছি আমরা। মিস ব্লেজনের ভাগ্যে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন।

কিন্তু রাগল না হ্যারি কিলার। বরং দানবীয় উল্লাস ফুটল তার চোখে মুখে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিস ব্লেজনের দিকে।

'দারুণ তেজী মেয়ে!' মন্তব্য করল হ্যারি কিলার।

পরমুহূর্তেই ধাঁই করে এক লাথি মারল আকাশ থেকে ফেলে দেয়া নিগ্রোর থেঁতলানো মাংসপিণ্ডে। বলল, 'আরে বুদ্ধু মেয়ে, এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা গরম করলে চলে না কি?'

গার্ডদের ইশারা করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল হ্যারি কিলার। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে আবার সেই বিশাল হল ঘরটায় এসে ঢুকলাম। কয়েদখানা থেকে এ ঘরেই আমাদের নিয়ে আসা হয়েছিল প্রথমে।

আমরা ঢোকার আগেই তার চেয়ারে এসে বসে আছে হ্যারি কিলার।

আমাদের কারও দিকে আর নজর নেই এখন হ্যারির। হাঁ করে চেয়ে আছে মিস ব্লেজনের দিকে। দুই চোখে নোংরা দ্যুতি। অশুভ ছায়াপাত। দৃষ্টি দেখে হিম হয়ে এল আমার হাত-পা। শির শির করে উঠল শিরদাঁড়াটা।

একটানা মিনিট পাঁচেক একইভাবে কাটাল হ্যারি কিলার। তারপর আচমকাই কথা শুরু করল, 'আমার ক্ষমতা তো দেখলেন? আমার কথায় নাক সিঁটকালে কি করতে পারব আমি, তাও আন্দাজ করতে পারছেন এখন। আর একটা প্রস্তাব করব। এবং এই-ই শেষ। জানি, আমি আপনাদের একজন রিপোর্টার, একজন দক্ষ পলিটিশিয়ান, একজন ডাক্তার এবং আর দু'জন বোকা পাঁঠা...।'

বোকা পাঁঠা বলে সেন্ট বেরেন আর পঁসির ওপর সাংঘাতিক অবিচার করল হ্যারি কিলার। তাই মনে হলো আমার।

'হ্যাঁ, ফরাসী সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালানোর ভার বারজাকের।' বলেই চলল হ্যারি কিলার, 'কথা দিচ্ছি, একটা অতি আধুনিক হাসপাতাল বানিয়ে দেব ডক্টর চাতোন্নেকে। ব্ল্যাকল্যান্ড থান্ডারবোল্টের ভারটা আপনি, মানে আমিদী ফ্লোরেন্সকেই দিয়ে দিতে চাই। যত বোকাই হোক; পাঁঠা দুটোকেও মোটামুটি ভাল কাজই দিতে পারব আমি। বাকি থাকল এই মেয়েটা। বয়েস একেবারে কম। কিন্তু মেয়েদের বয়েস কমে কিছু আসে যায় না। আর আমার বয়সই বা এমন কি বেশি? নাহ্, ওকে আমি বিয়ে করলে মোটেই বেমানান হবে না।'

হাঁ হয়ে গেলাম। এই বদ্ধ পাগলটার সঙ্গে বিয়ে!

'এর কোনটাই হবে না।' দৃঢ় গলায় বললেন বারজাক, 'গায়ের জোরে যদি পারেন। কিন্তু তাও পারবেন কিনা সন্দেহ আছে আমার। আর মিস ব্লেজনের সম্পর্কে বলা কথাটা তো...'

'হোয়াট? মিস ব্লেজন।' ভুরু কুঁচকে গেছে হ্যারি কিলারের, 'পুরো নাম কি?'

'জেন ব্লেজন।' বললেন জেন।

'জেন ব্লেজন! ব্লেজন!' আপন মনেই বিড় বিড় করল হ্যারি কিলার।

অবাক হলেন জেন। তাঁর নাম শুনে অমন করছে কেন খুনেটা? জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলেন না, 'নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে নাকি?'

'হবে না? ব্রেজন পরিবারের সঙ্গে আমার যে চিরশত্রুতা।' বলতে বলতে রাগে লাল হয়ে উঠল হ্যারি কিলারের মুখ।

সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন জেন, 'কোন ব্রেজনের সঙ্গে? কাকে চেনেন আপনি?'

'কাকে চিনি?' দুই চোখে আগুন জ্বলছে হ্যারি কিলারের, 'চিনি লর্ড ব্রেজনকে। চিনতাম ক্যাপ্টেন জর্জ ব্রেজনকে। চিনি লুই···।' হঠাৎই থেমে গেল সে। 'কিন্তু আপনি? লর্ড ব্রেজন কি হয় আপনার?'

'কোথাকার লর্ড ব্রেজন?' কথা বের করতে চাইছেন জেন। দরকার হলে নিজের পরিচয় গোপন করবেন।

'জর্জ ব্রেজনের বাপ লর্ড ব্রেজন একজনই আছে। আইরিশ। কি হয় আপনার?'

আড়চোখে নিজের সঙ্গীদের মুখের দিকে চাইলেন একবার জেন। সবাই পাথরের মত স্থির, মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। বিপদ আঁচ করে ফেলেছে ওরা সবাই।

'কি হলো, কথা বলছেন না কেন?' প্রায় গর্জে উঠল হ্যারি কিলার।

'আমি আইরিশ নই,' মিছে কথা বললেন জেন, 'আমরা সাত পুরুষ ধরে স্কচ। বাপের নাম রিচার্ড ব্রেজন। বাপের একমাত্র সন্তান আমি। কোন ভাইবোন নেই।'

'ওহ্!' পনেরো সেকেন্ড একটানা পায়চারি করল হ্যারি কিলার। আস্তে আস্তে রাগ ঠাণ্ডা হয়ে এল। হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল। চাইল জেনের দিকে। মুখে ক্রূর হাসি, 'তাহলে আপনি জেন ব্রেজন? জেন, না? চমৎকার নাম! বৌকে অমন নামে ডাকতে ভালই লাগবে।'

অপমানে রাগে প্রায় অন্ধ হয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন মিস ব্রেজন, 'আপনার মত পাষণ্ডের গলায় মালা পরাচ্ছি না আমি কিছুতেই। তারচে' একটা শুয়োরের গলায় পরাব, সেও অনেক ভাল। খুনে, শয়তান···'

কথা আটকে গেল তাঁর গলায়।

কিন্তু মোটেই রাগল না কিলার। হা হা করে অট্টহাসি হাসল।

'দারুণ! চমৎকার! এই না হলে সম্রাট হ্যারি কিলারের বউ···।'

হঠাৎই হাসি থামিয়ে দিল সে, 'ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। এক মাস সময় দিলাম। ভাল করে ভেবে নিন আপনারা সবাই।'

হঠাৎই আবার স্বমূর্তি ধারণ করল হ্যারি কিলার। ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল গার্ডদের উদ্দেশে, 'নিয়ে যাও এদের!'

জোর করে গার্ডদের হাত ছাড়িয়ে ঘুরে চাইলেন বারজাক, 'একমাস পরে যদি না মানি, কি করবেন?'

মদের গেলাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে ফেলেছে ততক্ষণে হ্যারি কিলার। ঢক ঢক করে গেলাসের মদটুকু শেষ করে বারজাকের দিকে চাইল। তারপর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবিনি এখনও। ফাঁসি দেয়াতে আজকাল আর কোন মজা পাই না আমি। তবে কষ্টদায়ক মৃত্যুর অনেক উপায়ই জানা আছে আমার।'

চার

২৬ মার্চ—৮ এপ্রিল।

হ্যারি কিলারের নৃশংসতায় দমে এতটুকু হয়ে গেল অভিযাত্রীদের মন। কখন আবার কি অনর্থ ঘটায় নিষ্ঠুর পাগলটা, তাই ভয়ে ভয়ে রইল তারা।

অভিযাত্রীদের অবাক করে দিয়ে কিন্তু পরদিন থেকে তাদের সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার শুরু করল হ্যারি কিলার। বোধহয় জেনের মন জয় করার জন্যেই গ্যালারির ছাদে ওঠার অনুমতি দিল। অভিযাত্রীদের কয়েদখানার ওপরেই এই গ্যালারি। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। গ্যালারির বাইরেই কিন্তু সকাল-বিকাল সিপাই-সান্ত্রীদের কর্কশ গলা আর অস্ত্র ঠোকাঠুকির আওয়াজ পাওয়া যায়।

দিনের বেলা চড়া রোদে ছাদে বসা সম্ভব নয়। তাই বেলা শেষে রোদ পড়ে এলে সবাই গিয়ে ছাদে ওঠে। চেয়ার নিয়ে বসে শহরের দৃশ্য দেখে আর গল্প করে। বেশির ভাগ সময়েই, কি করে পালানো যায় এই নিয়ে ফন্দি আঁটে তারা। কিন্তু বৃথা। পালানোর কোন উপায়ই বের করতে পারে না এত ভেবেও।

খাবার নিয়ে আসে চৌমৌকি। ও এলেই একেবারে চুপ মেরে যায় অভিযাত্রীরা। বিশ্বাসঘাতকটাকে বিশ্বাস নেই। কান পেতে সব শুনে গিয়ে হয়তো লাগাবে হ্যারি কিলারের কাছে। আর সোজা ওদের নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে খুনেদের সর্দারটা।

গ্যালারির ছাদ অনেকটা বুরুজের মত। দু'দিকে ছড়ানো। পুব দিকে প্যালেসটা। মাঝে মাঝে চত্বর। এই চত্বর পেরিয়েই সাইক্লোসকোপ মেশিনের কেরামতি দেখতে গেছে অভিযাত্রীরা। এসপ্ল্যানেডের ওপর গিয়ে শেষ হয়েছে একদিকের ছাদ। তারপরেই উঁচু পাঁচিল, এবং তারপরে রেড রিভার। ছাদ থেকে নব্বই ফুট নিচে। অন্য প্রান্ত চলে গেছে প্যালেস ছাড়িয়ে ফ্যাক্টরির ওপর। তারপরে আবার পাঁচিল। সুতরাং পালানোর আশা করাই ভুল।

এসপ্ল্যানেডের দিক দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অনবরত যাওয়া আসা এদিকে কাউন্সিল মেরি ফেলো আর নিগ্রো গার্ড-দাসদের। তাছাড়া আছে উঁচু পাঁচিল। ডিঙানো অসম্ভব।

অন্যদিকে তো রেড রিভারই। তাও নব্বই ফুট নিচে। নিচের দিকে চাইলেই মাথা ঘুরে ওঠে। তবে সাংঘাতিক রকম দুঃসাহস থাকলে এদিক দিয়েই পালানোর চেষ্টা করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বেশ কিছু উপকরণ দরকার। যেমন লম্বা দড়ি, নৌকা ইত্যাদি। তা তো আর পাচ্ছে না, কাজেই পালানোও আর হচ্ছে না অভিযাত্রীদের।

কি আর করা। বিকেল বেলা ছাদে বসে শহরের দৃশ্য দেখাই সার। রেড রিভারের দু'পাশে বিশাল সব মহীরুহের সমাবেশ। মাত্র দশ বছরে গাছগুলো এতবড় হলো কি করে, বুঝতে পারে না অভিযাত্রীরা। ব্ল্যাকল্যান্ডের ভাগ করা তিনটে

অংশও পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে। দেখা যায় শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণকায়দের কর্মব্যস্ততা।

ফ্যাক্টরির দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায় অভিযাত্রীদের। রীতিমত তাক লেগে যায়। আজব মরু শহরের মধ্যে যেন আরেকটা শহর। একদম আলাদা। পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘিরে রাখা হয়েছে। বেরোনোর কোন পথ দেখা যায় না। কেন?

রীতিমত সুরক্ষিত এই শহরের বাচ্চাটা। নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেন নিজেরাই করে নিয়েছে। বাইরের শহরের সঙ্গে ভেতরের যোগাযোগ বলতে কিছু নেই। বিশাল কারখানার বিশাল চিমনিও আছে। কিন্তু ধোঁয়া বেরোয় না কেন ওই চিমনি দিয়ে? প্যালেস টাওয়ারের মতই ওখানেও টাওয়ার আছে একটা। কিন্তু বেমক্কা রকমের উঁচু আর পাইলনে ঠাসা। ওই শ'খানেক গজ উঁচু টাওয়ারের প্রয়োজনীয়তাটা কি? ঘুরে ফ্যাক্টরির ধার ঘেঁষেই চলে গেছে রেড রিভার। পাড়ে বিশাল সব ইমারত। কেন? অনেকগুলো বাড়ির দেয়ালে সবুজ রঙের কিসের যেন প্রলেপ। সবচেয়ে বড় বাড়িটায় রয়েছে অত্যাধুনিক বিপণী কেন্দ্র। একপাশে ফলের বাগান। ঘেরা পাঁচিলের মাথায় ধাতুর তৈরি অদ্ভুত সব কি যেন। কেন? পাঁচিলের ওদিকে দূরে ধু-ধু মরুভূমি। সবকিছু দেখে শুনে একটাই ধারণা হলো অভিযাত্রীদের, বাইরের সাহায্যের খুব একটা দরকার নেই ফ্যাক্টরি শহরের। নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারে এর অধিবাসীরা। এটা আবার আরেক রহস্য।

এসব ব্যাপারে চৌমৌকিকে অনেক জিজ্ঞেস করল অভিযাত্রীরা। কিন্তু উত্তর পেল না। বরং জিজ্ঞেস করলেই কেমন যেন আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়। চোখ বড় বড় করে বলে, 'কারখানা···কারখানা···শয়তানের কারখানা!' ব্যস, এইটুকুই। কিন্তু অত ভয় কেন খুদে ওই শহরটাকে? কি লুকিয়ে আছে বিশাল সব অট্টালিকার ভেতর? কুসংস্কার, না সত্যিই আতঙ্কিত হওয়ার মত আছে কিছু?

আজব শহরের আজব ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অভিযাত্রীরা।

জেনকে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে হ্যারি কিলার। প্যালেস আর এসপ্ল্যানেডের যেখানে খুশি যাওয়ার অনুমতি আছে তার। অন্যদের সে-স্বাধীনতা নেই। কিন্তু রেড রিভার পেরোনোর অনুমতি নেই জেনেরও। ক্যাসল ব্রিজে সারাক্ষণই পাহারায় থাকে সশস্ত্র সান্ত্রি।

স্বাধীনতা পেয়েও ভোগ করে না জেন। বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি নয় সে।

জেনের এই ব্যবহারে অবাক হয়েছে চৌমৌকি। চোখ কপালে তুলে বলেছে, 'আরে মেমসাব! দু'দিন পরে না মাস্টারের বেগম হবেন। কত সোনাদানা, হীরে জহরৎ পাবেন, তাছাড়া সম্রাজ্ঞী হবেন এই ব্ল্যাকল্যান্ডের। সব কিছু দেখে শুনে নিচ্ছেন না কেন?'

জবাব দেয়নি জেন। পাত্তাও দেয়নি চৌমৌকির কথা।

এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও কিন্তু হাসিঠাট্টা চলে অভিযাত্রীদের নিজেদের মধ্যে। সুযোগ পেলেই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে বসেন বারজাক। তাছাড়া বার বার মহড়া দিচ্ছেন একটা বিশেষ বক্তৃতার, অভিযাত্রীদের সামনেই। হ্যারি কিলারের

সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হলেই ঝাড়ার ইচ্ছে।

লেখা রিপোর্টগুলো বার বার পড়ে দেখে আমিদী ফ্লোরেন্স। আরও উন্নত করে তোলে। বারজাক মিশনের সাড়া জাগানো কাহিনী ছেপে তাক লাগিয়ে দেবার ইচ্ছে পৃথিবীবাসীকে।

সেন্ট বেরেন আর ডক্টর চাতোন্নের সময় কিন্তু আর কাটতে চায় না। রোগী পাচ্ছেন না ডাক্তার। মুখ গোমড়া করে রাখা ছাড়া করার কিছুই নেই। ওদিকে মাছ ধরতে পারছে না সেন্ট বেরেন। শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে তো, আবার মাছের নেশায় পেয়েছে। লোভাতুর দৃষ্টিতে রেড রিভারের দিকে তাকিয়ে থাকে আর আপন মনে বিড় বিড় করে।

ডিক্‌শন্যারির মত মোটা নোট বইয়ে সারাক্ষণই মাথা গুঁজে কি যেন লেখেন পঁসি। ক্রমেই কৌতূহল বাড়ছে ফ্লোরেন্সের। এত কি লেখে লোকটা?

শেষে একদিন থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে বসল, 'সারাক্ষণ এত কি লেখেন, মঁসিয়ে?'

'ধাঁধা। জবাব চাই।' সংক্ষিপ্ত উত্তর। ভীষণ গম্ভীর গলা পঁসির।

'ধাঁধা?'

'তাই। এই যে শুনুন না এটা…।' বলে একটা ধাঁধা শুনিয়ে দিল ফ্লোরেন্সকে পঁসি। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না রিপোর্টার। টের পেয়ে হে হে করে হাসল পঁসি। বলল, 'অত সহজেই কি আর বুঝবেন? এটা চাইনীজ ধাঁধা যে।'

'আসলে পাগলিজ ধাঁধা, তাই না?'

'হোয়াট? কি নাম বললেন?'

'পাগলিজ, পাগলিজ। নিছক পাগলামি তো, তাই থেকে নামটার উৎপত্তি। তা অত মনোযোগ দিয়ে কি এসবেরই জবাব খোঁজেন?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া ধাঁধা তো শুধু একটাই নয়। প্রশ্নও অনেক আছে। যেমন এগারোশো সাতানব্বই নম্বরটার জবাব একটু আগে পেয়ে গেছি।'

'সঠিক সমাধান তো?'

'তাছাড়া কি? কি মনে হয় আপনার?'

'জঙ্গলে থাকতে, মানে আমি বলতে চাইছি জঙ্গল ঠেঙিয়ে আসার সময় অনেক কিছুই লিখেছেন নোট বইয়ে। কতগুলো দুর্বোধ্য সংখ্যা। মানে বের করতে পেরেছেন?'

'মানে বের করেই লিখেছি।'

'ওই এলোমেলো মাথামুণ্ডু ছাড়া সংখ্যার?'

'দেখুন আমি স্ট্যাটিসটিশিয়ান। ওই এলোমেলো সংখ্যাই আমার কাছে কাহিনী।'

'যেমন?'

'নোট বইয়ে পরিসংখ্যানের হিসেব লিখেছি।'

'মানে?'

'মানে? সোজা। যেমন জঙ্গলে ক'টা চোখা শিংওলা হরিণ দেখেছিলাম তার হিসেব। লিখে রেখেছি ফেব্রুয়ারির ষোলো তারিখে। হিসেবটা বলছি। নাইজারের

ক্ষেত্রফল যদি পঁচিশ হাজার বর্গমাইল হয়, তাহলে সেখানে ওই রকম হরিণের সংখ্যা হলো পাঁচ লক্ষ ছাপান্ন হাজার পঞ্চান্নটা। অবাক হচ্ছেন তো?'

'নিশ্চই, নিশ্চই। না হয়ে উপায় আছে!'

উৎসাহ বেড়ে গেল পঁসির। বলল, 'দেখছেন নিশ্চয়, এই অঞ্চলের নিগ্রোদের হাতে উল্কি দিয়ে রেখা আঁকা হয়েছে। শুধু নাইজার অঞ্চলের নিগ্রোদের সমস্ত উল্কিরেখা একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া দেয়া গেলে মোট এক লক্ষ তিন হাজার পাঁচশো উননব্বই বার বেড় দেয়া যাবে পৃথিবীকে।'

'হুঁম্‌ম্‌! এই না হলে স্ট্যাটিসটিশিয়ান!'

'ঠিক ধরতে পেরেছেন আপনি। আরও হিসেব জানাচ্ছি আপনাকে। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে নাইজার বেন্ডের মোট জনসংখ্যা ছিল চোদ্দ লক্ষ ঊনআশি হাজার একশো চোদ্দ জন।'

'কিন্তু নোট বইয়ে দেখলাম ষোলোই ফেব্রুয়ারি জনসংখ্যা লিখেছেন আরও অনেক কম। মাত্র চার লাখ সত্তর হাজার ছ'শো বায়ান্ন জন?'

'ঠিকই দেখেছেন। আমার কথাও ঠিক, আপনার দেখাও।'

'অর্থাৎ? মড়ক লেগে হুড় হুড় করে মরে শেষ হয়ে গেছে নিগ্রোগুলো?'

'দেখুন মঁসিয়ে, স্ট্যাটিসটিকস একটা আশ্চর্য বিজ্ঞান। একেক দিন এর হিসেব একেক রকম হয়ে যায়। এবং সামান্য দশ লক্ষের পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান না। কাজেই দুটো তারিখের দুটো হিসেব দু'রকম হবেই। হিসেব করার মত মেজাজ তো আর সবদিন থাকে না। এই মেজাজটাকে প্রাধান্য দেয় বলেই বিজ্ঞানটা নিয়ে পড়েছি আমি। এই দেখুন না, মানুষের মাথার চুল বৃদ্ধির সঙ্গে জোয়ার-ভাটার সম্পর্কটা অঙ্কের হিসেবে লিখে রেখেছি···।'

আর শোনার কৌতূহল নেই আমিদী ফ্লোরেন্সের। কায়দা করে সরে পড়ল সে।

ওদিকে হ্যারি কিলারকে নিয়ে গভীর গবেষণা শুরু হয়েছে।

'লোকটাকে কোন্ দেশী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন বারজাক।

'ভাষা আর উচ্চারণ শুনে ইংরেজ বলেই মনে হয়।' বলল জেন।

'অসাধারণ ইংরেজ। মাত্র দশ বছরে সাহারার মত মরুভূমির বুকে শস্য ফলাতে পারে, ক্ষমতাটা ভেবে দেখার মত। বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দরকার।' মন্তব্য করলেন বারজাক।

'আমার কিন্তু মনে হয়, এসবের পেছনে অন্য কোন ব্রেন কাজ করছে। হ্যারিটা তো বদ্ধ উন্মাদ।' যোগ দিল ফ্লোরেন্স।

'অর্ধবদ্ধ।' বললেন ডাক্তার।

'অর্ধবদ্ধ?' অবাক হয়ে সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'বুঝলেন না? মানে আধ পাগল।' বুঝিয়ে দিলেন ডাক্তার। 'বাকি অর্ধেকটা মাতাল। এবং সেজন্যেই বদ্ধ পাগলের চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক। বদ্ধ পাগল বা বদ্ধ মাতাল না বলে বদ্ধ উন্মাতাল বলা যায় তাকে।'

ডাক্তারের কথায় হো হো করে হেসে উঠল সবাই, বারজাক ছাড়া।

'হ্যারি কিলারের মত চরিত্র আরও আছে আফ্রিকায়,' গম্ভীর গলায় বললেন বারজাক। 'কথার কথায় মানুষ খুন করে এরা। যে কোন ধরনের নিষ্ঠুরতা কিছুই না

এদের কাছে।'

'আপনারা যে যাই বলুন,' বলল ফ্লোরেন্স, 'আমি কিন্তু বদ্ধ উন্মাদই বলব ওকে। একেবারে পাগল। এই রাগছে, এই ঠাণ্ডা হচ্ছে। হয়তো এখন আমাদের কথা মনেই নেই। মনে হলেই ধরে নিয়ে গিয়ে হয়তো ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সাতটা দিন কেটে গেল। কিন্তু পালানোর কোন উপায়ই করতে পারল না অভিযাত্রীরা।

পর পর দুটো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল তেসরা এপ্রিল। এ দিন বিকেল তিনটে নাগাদ অভিযাত্রীদের অবাক করে দিয়ে এসে পৌঁছল মালিক। এসেই আছড়ে পড়ল একেবারে জেন ব্রেজনের পায়ের কাছে।

পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে এসেছে মালিক। পায়ে হেঁটে। পথে ওর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে বিশজন নিগ্রো সৈন্য। সার্জেন্ট দুজন আরও বাড়া।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল, টোনগানের কোন খবর জানে না মালিক।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল চৌমৌকি। ভীষণ উত্তেজিত। কি ব্যাপার? জেনকে নিতে পাঠিয়েছে হ্যারি কিলার।

মারমুখো হয়ে তেড়ে উঠল অভিযাত্রীরা। চুপচাপ বসে বসে দেখতে লাগল জেন।

কাকুতি মিনতি করতে লাগল চৌমৌকি। বলল, 'দোহাই আপনাদের, অমন করবেন না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে। মাস্টার রেগে গেলে একজনকেও আস্ত রাখবে না।'

কিন্তু চৌমৌকির কথায় কানই দিল না কেউ। সোজা হাঁকিয়ে দিল তাকে।

চৌমৌকি চলে যেতেই আলোচনা আরম্ভ হলো। হঠাৎ এই তলব কেন হ্যারি কিলারের? এক মাসের তো এখনও অনেক দেরি। মত পাল্টে ফেলেছে খুনেটা? আসলে উন্মাদটার কথায় বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে অভিযাত্রীদের। সে যাই হোক, প্রাণ থাকতে কিছুতেই জেনকে একা হ্যারি কিলারের কাছে যেতে দেয়া হবে না, ঠিক করল সবাই।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি জেন। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেই উঠে দাঁড়াল সে, 'খামোকা ভয় পাচ্ছেন আপনারা।' বলল সে। পোশাকের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে সবাইকে দেখাল, 'এই দেখুন। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে।'

আবার আগের জায়গায় ছুরিটা লুকিয়ে ফেলল জেন। প্রায় তখুনি আবার এসে হাজির হলো চৌমৌকি। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসছে দুই চোখ। কাঁপছে থর থর করে। বলল, 'দোহাই আপনাদের। খেপে গিয়ে পাগলের মত চেঁচাচ্ছে মাস্টার। এখুনি মিস ব্রেজনকে যেতে না দিলে আপনাদের ছ'জনকেই ফাঁসী দেবে মেরি ফেলোরা।'

'দিক।' একসঙ্গে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল পাঁচজন পুরুষ।

কিন্তু চৌমৌকি কিছু বলার আগেই তাদের সামনে এসে দাঁড়াল জেন। বলল, 'আমার জন্যে আপনাদের ফাঁসীতে ঝুলতে দেব না কিছুতেই। এমনিতেই আপনাদের বিপদে ফেলার জন্যে মরমে মরে যাচ্ছি আমি।' চৌমৌকির দিকে ফিরে

বলল, 'চল। আমি যাব।'

সঙ্গীদের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে চৌমৌকির পেছনে পেছনে সহজ ভঙ্গিতে চলে গেল জেন।

ঠিক তিন ঘণ্টা পরে, আটটায় ফিরে এল জেন। সাংঘাতিক উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছে তার সঙ্গীরা। দেখেই একযোগে প্রশ্ন করল, 'কি, কি হলো? খারাপ কিছু নয়তো?'

'কি আবার হবে?' গলা কাঁপছে জেনের।

'মানে, মানে কেন ডেকেছিল খুনেটা?' জিজ্ঞেস করল সেন্ট বেরেন।

'বড়াই করার জন্যে। সারাক্ষণই বেহায়ার মত শুধু নিজের প্রশংসা। শেষে বলল, আমার মত ছোট্ট একটা মেয়েকে যে বিয়ে করতে চেয়েছে সে, এতেই কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত আমার। সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করে রাখবে। মনে করিয়ে দিলাম, ভাববার জন্যে একমাস সময় দেয়া হয়েছে আমাকে। তার আগেই এসব বলার জন্যে মেজাজ দেখালাম। কিন্তু আশ্চর্য! একটুও রাগল না হ্যারি কিলার। বরং হাসল। বলল, এক মাস সময়ের কথা মনে আছে তার। কিন্তু একটা ব্যাপারে মত পাল্টেছে। রোজ বিকেলে গিয়ে সঙ্গ দিতে হবে তাকে।'

'রাজি হলি তুই?' উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এল সেন্ট বেরেন।

'হ্যাঁ। হলাম। ভেবে দেখলাম, তার ওপর প্রভাব খাটাতে পারব আমি। সুতরাং সুযোগটা হাতছাড়া করা বোকামি হবে। ঝুঁকিও নেই। আমি গিয়ে তো দেখি, বসতেই পারছে না ঠিকমত। পাঁড় মাতাল। গিয়েই গেলাসে মদ ঢেলে দিলাম। হ্যারি তো ভারি খুশি। তারপর থেকে সারাক্ষণই মদ ঢেলে আর পাইপ ধরিয়ে দিলাম খুনেটার। এই তো, খানিক আগে টেবিলের ওপরেই ঢলে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করল সে। চলে এলাম।'

এরপর থেকে রোজই তিনটের দিকে হ্যারি কিল্যারের কাছে যেতে লাগল জেন। ঠিক আটটায় ফিরে আসে।

কোন কোন দিন গিয়ে দেখে, সাংঘাতিক চরিত্রের কাউন্সিলরদের নিয়ে মীটিঙে বসেছে হ্যারি কিলার। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পরামর্শ দিচ্ছে কর্মচারীদের, হুকুম করছে, এই সময় দেখলে কেউ বলবে না, সামান্যতম মদ ছোঁয় হ্যারি কিলার। নিখুঁত পরামর্শ দিচ্ছে সঙ্গীদের। রাজ্য চালনায় বিন্দুমাত্র ভুল নেই। মাঝে মাঝে এক আধজন কাউন্সিলরকে কাছে ডেকে কানে কানে কি সব বলে হ্যারি কিলার। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য জেনের কাছে।

ঘণ্টাখানেক পরেই চলে যায় কাউন্সিলররা। তারপর থেকে হ্যারি কিলারের সঙ্গে একেবারে একলা থাকে জেন। আরেকটা ব্যাপার নিয়মিত ঘটে রোজ। ঠিক সাড়ে চারটের দিকে জেনকে বসতে বলে কোমর থেকে চাবি নিয়ে পেছনের একটা দরজার তালা খুলে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যায় হ্যারি কিলার। আধ ঘণ্টা মত থাকে। এই সময়টুকুতে মানুষের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ভেসে আসতে থাকে ছোট্ট দরজার ওপাশ থেকে। কে কাতরায়! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে জেনের, এগিয়ে গিয়ে উঁকি দেয়, কিন্তু সাহস হয় না।

পাঁচটা নাগাদ খুশিতে প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে হ্যারি কিলার।

এসেই হুকুম দেয় মদ আর তামাকের। গেলাসে মদ ঢেলে দেয় জেন, পুরানোটা ফেলে নতুন তামাক ঠেসে পাইপ ধরিয়ে দেয়। সাতটার পর পরই নাক ডাকানো শুরু হয় হ্যারি কিলারের। ফিরে আসে জেন।

ফিরে আসার আগে একটা কাজ করার খুবই লোভ হয়। কিন্তু কয়েকটা কথা না জেনে কাজটা করবে না সে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, তাদের ছয় অভিযাত্রীদের বাঁচতে হলে এখন হ্যারি কিলারের একান্তই দরকার। একমাত্র তাকেই যমের মত ভয় করে ব্ল্যাকল্যান্ডবাসীরা। যেই সে মরবে মেরে ফেলা হবে অভিযাত্রীদের। সুতরাং, পালাবার উপায় ঠিক না করে হ্যারি কিলারকে মারা একেবারেই বোকামি হবে।

অবশ্য জামিন হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বরং অভিযাত্রীদের সঙ্গে বন্দী হ্যারি কিলারকে খুন করে নিশ্চিন্ত হবে মেরি ফেলোরা। সাম্রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। কার আগে কে রাজা হবে, এই নিয়ে চলবে খুনোখুনি। কাজেই এই চিন্তাটাও বাদ দিল জেন।

রোজই নিয়মিত হ্যারি কিলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় জেন। মহাখুশি কিলার। মেরি ফেলো আর ব্ল্যাকগার্ডেরা জেনে গেছে, জেনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। তাই জেনকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে তারা। কে জানে, আবার কোন্ জিনিসটা পছন্দ করবে না বিদেশী মেয়েটা, লাগাবে গিয়ে হ্যারি কিলারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গর্দান যাবে অপরাধীর। কাজ কি বাবা গোলমাল করে। কোনমতে জানটা টিকিয়ে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

গেল আরও পাঁচটা দিন।

৮ এপ্রিল। যথারীতি হ্যারি কিলারকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে জেন। খাওয়া দাওয়া শেষ। রাত সাড়ে ন'টা। চৌমৌকি এঁটো বাসনপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত। ছাদে এসে উঠল অভিযাত্রীরা। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল এক প্রান্তে। এদিকেই রেড রিভার।

অন্ধকার আকাশ। ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। বাতাস ভারি স্যাঁতস্যাঁতে। বর্ষণের দেরি নেই।

ছাদেও অন্ধকার। রেড রিভারের দুই তীরে লম্বা লম্বা লাইটপোস্টে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। কিন্তু সে অনেক নিচে। অত উপরে ছাদে আলো পৌঁছায় না।

সবে বিকেল বেলা হ্যারি কিলারের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতার কথা সঙ্গীদের বলতে যাচ্ছে, পায়ের কাছে ঠক করে এসে পড়ল একটা কি যেন। চমকে উঠল সবাই। স্থির হয়ে গেল চকিতে।

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। তার পরেই নিচু হয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিল ফ্লোরেন্স। তেমন কিছু না। বেশ বড়সড় একটা নুড়ি পাথর। কিন্তু নুড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি না! তাই তো!

টান লাগল দড়িতে। তালে তালে টানছে কেউ! কে? কি ইঙ্গিত করছে? শত্রু না বন্ধু? হ্যারি কিলারের ফাঁদ? নাকি সত্যিই কোন বার্তা পাঠাল বন্ধু কেউ? কিন্তু এই ব্ল্যাকল্যান্ডে অমন বন্ধু ওদের কে থাকতে পারে?

সাত পাঁচ ভেবে দেখার সিদ্ধান্ত নিল ফ্লোরেন্স। দড়ি ধরে টানতে লাগল।

পরিষ্কার বোঝা গেল পাঁচিলের ওপাশে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠে আসছে কেউ। একা পারল না ফ্লোরেন্স। সাহায্য করার জন্যে ডাকল ডাক্তারকে। এবারে আর টেনে তুলতে কোন অসুবিধে হলো না।

ফুট তিরিশেক তোলার পরই আটকে গেল দড়ির অন্যমাথা। আর উঠছে না। উঁকি মেরে নিচের দিকে তাকাল ফ্লোরেন্স। পাঁচিলের মাথায় উঠে বসেছে একটা ছায়ামূর্তি। ঝুঁকে কি যেন করছে। একটা পিলারের বেরিয়ে থাকা মাথার সঙ্গে বাঁধছে দড়িটা, বুঝল ফ্লোরেন্স।

ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা একটা শিকের সঙ্গে দড়ির এদিকের মাথাটা বাঁধল ফ্লোরেন্স। ছাদের ওপরে আরও তলা হবে, শিকটা তার প্রমাণ।

এগিয়ে গিয়ে আবার উঁকি মারল নিচে ফ্লোরেন্স। দড়ি ধরে ঝুলে পড়েছে ছায়ামূর্তিটা। একটু একটু করে উঠে আসছে। লোকটার দুঃসাহস অবাক করল ফ্লোরেন্সকে। কে?

কয়েকবার পিছলে পড়তে পড়তেও বেঁচে গেল ছায়ামূর্তিটা, দেখল ফ্লোরেন্স। কিন্তু উঠে এল শেষ পর্যন্ত।

কার্নিসের কাছে এসে একটা হাত বাড়াল লোকটা সাহায্যের জন্যে। ফ্লোরেন্স আর ডক্টর চাতোন্নে বাড়ানো হাতটা চেপে ধরে তুলে আনলেন লোকটাকে।

তারপরই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সবাই। অন্ধকারেই চিনতে পেরেছে ওরা লোকটাকে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই।

'টোনগানে!'

পাঁচ

সত্যিই বেঁচে আছে টোনগানে। এমন কি বহাল তবিয়তেই আছে। টোনগানের মুখেই শুনল অভিযাত্রীরা।

অন্ধকারে সেদিন জঙ্গলের মধ্যে অভিযাত্রীদের ঘিরে ধরেছিল হ্যারি কিলারের সৈন্যরা। কিন্তু তার আগেই বিপদের গন্ধ পেয়ে পালিয়েছে টোনগানে। গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছে।

সকাল হলে আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখেছে কিম্ভূতকিমাকার কয়েকটা আকাশযানে তোলা হচ্ছে অভিযাত্রীদের। কিন্তু সৈন্যরা উঠছে না।

হেলিপ্লেনগুলো চলে যাবার পর ঘোড়সওয়ারদের পেছনে ছায়ার মত লেগে থেকেছে টোনগানে। মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে ছুটন্ত ঘোড়ার পেছন পেছন।

এই ভাবেই সৈন্যদের অনুসরণ করে একদিন সাঁঝের বেলা এসে পৌঁচেছে ব্ল্যাকল্যান্ডে। সারাটা রাত লুকিয়ে থেকেছে খেতখামারের কাছেই একটা ছোট ঝোপে। ভোর হলে নিগ্রো চাষীদের সঙ্গে মিশে কাজ করেছে। বেদম মার খেয়েছে নিগ্রো সান্ত্রীদের হাতে। কিন্তু টুঁ শব্দ করেনি। আবার সাঁঝ এলে এসে ঢুকেছে শহরে। চাষীদের একজন হয়ে গিয়ে ঢুকতে কোন অসুবিধে হয়নি। হাজার হাজার

চাষীর মধ্যে তাকে আলাদা করে চিনে নিতে পারেনি ব্ল্যাকগার্ডেরা।

দাসেদের কোয়ার্টারে গত কয়েকটা দিন কাটিয়েছে টোনগানে। সঙ্গে বেশ কিছু সোনার মোহর ছিল। তারই কয়েকটা খরচ করে ভাব জমিয়েছে একজন গার্ডের সঙ্গে। কথায় কথায় জেনে নিয়েছে বন্দীরা, মানে অভিযাত্রীরা কোথায় আছে।

বিরাট সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে দড়ি জোগাড় করতে কোন অসুবিধে হয়নি টোনগানের। বুরুজের ছাদে প্রায়ই টহল দিতে দেখেছে সে অভিযাত্রীদের। দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও চেয়েছে। কিন্তু সফল হয়নি। তাই আজ মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশের সুযোগটা নিয়েছে। সাঁতরে পেরিয়েছে রেড রিভার। তারপর দড়ি বেয়ে উঠে আসায় তো সাহায্যই করল ফ্লোরেন্স আর চাতোন্নে।

টোনগানে বলল, পালানোর এইই সুযোগ। দড়ি বেয়ে নেমে যেতে হবে। রেড রিভারের এপারে একটা নৌকা নোঙর করা আছে, দেখে এসেছে টোনগানে। এই মেঘলা রাতে ওই নৌকা আর কাজে লাগাবে না কোন গার্ড। ওটায় করেই নদী পাড়ি দেয়া যাবে।

বেশ ভাল নৌকা। চারজনে একসঙ্গে দাঁড় টানলে ঘণ্টায় ছ'মাইল অনায়াসে যাওয়া যাবে। এগারোটা নাগাদ রওনা হওয়া গেলে রাত ভোর হতে হতে পঁয়তাল্লিশ মাইল পেরিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। তারপর দিনের বেলা রেড রিভারের পাড়ে কোন ঘন ঝোপঝাড় দেখে লুকিয়ে পড়লে আর নৌকাটাও লুকিয়ে রাখলে হেলিপ্লেনে করে সার্চ পার্টি বেরিয়ে খুঁজে পাবে না অভিযাত্রীদের। আবার রাত নামলে শুরু হবে চলা। এমনি কোনমতে সায়ে পৌছুতে পারলেই পায় কে? মোটমাট দুশো আশি মাইল। ব্যাপারটা খুব একটা নিরাশাব্যঞ্জক নয়। তাই পালাতে রাজি হয়ে গেল অভিযাত্রীরা।

প্রথমেই বিশ্বাসঘাতক চৌমৌকির একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করল তারা। নিচের তলায় এখনও কাজ করছে সে। জেন আর পঁসিকে ছাদে রেখে সে-ঘরে গিয়ে ঢুকল সবাই। কোনরকম সন্দেহ করার কথা নয় তাদেরকে দেখে চৌমৌকির। করলও না। প্রথমেই আক্রমণ করল সেন্ট বেরেন। পেছন থেকে গিয়ে আলগোছে তুলে নিল সে চৌমৌকিকে। হালকা পাতলা লোকটার গায়ে অত শক্তি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সোজা মাথার ওপর তুলে চৌমৌকিকে আছাড় মারল বেরেন। 'গাঁক' করে একটা বিচ্ছিরি শব্দ বের হলো শুধু চৌমৌকির মুখ দিয়ে। জ্ঞান হারাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।। দ্রুত হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো তার। মুখে ন্যাকড়া ঠেসে দেয়া হলো। তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে ঘরের দরজা আটকে ভেতর থেকে তালা দিয়ে দিল ফ্লোরেন্স। বাইরে থেকে দরজা ভাঙা ছাড়া সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে পারবে না এখন আর বাইরের কেউ।

দ্রুত ছাদে উঠে এল পাঁচজনে। ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে ইতোমধ্যে। বিশ গজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। অত্যন্ত ঝাপসা দেখাচ্ছে নদীর ওপারের মেরি ফেলোদের কোয়ার্টারের আলো।

একটা সেকেন্ডও নষ্ট করল না কেউ। কাজে লেগে গেল। প্রথমেই দড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ফ্লোরেন্স। নেমেই নিচের দিকের বাঁধন খুলে ছাড়তে শুরু করল।

টোনগানেও ওপরের বাঁধন খুলে বাঁকানো শিকের খাঁজে এক প্যাচ দিয়ে অন্য মাথাটা নিচের দিকে ছাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত দড়ির দুটো মাথাই এসে গেল ফ্লোরেন্সের হাতে। দুটো মাথাই শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বাঁধল সে। উপরে দড়ির মাঝামাঝি অংশ আটকানো আছে ছাদের বাঁকানো শিকের খাঁজে।

এরপর দাড় বেয়ে একে একে নেমে এল সবাই নিচে। জেসকে কোমরে দড়ি বেঁধে নামানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে কিন্তু রাজি হয়নি সে। পুরুষদের মতই দক্ষভাবে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে নেমে এল নিচে। সবার শেষে নামল টোনগানে। খুঁটিতে বাঁধা দড়ির প্রান্ত খুলে নেয়া হলো। তারপর একমাথা ধরে টানতেই সড় সড় করে শিকের খাঁজ থেকে খুলে নেমে এল দড়িটা। কি করে পালাল তারা, কোন চিহ্নই থাকল না আর।

টোনগানের কথামত ঠিক জায়গায়ই পাওয়া গেল নৌকাটা। দখল করতেও কোন অসুবিধে হলো না। এই তুমুল ঝড়বাদলার রাতে নদীতে সামান্য একটা নৌকা পাহারা দেবার প্রয়োজন মনে করেনি কেউ।

এক এক করে নৌকায় উঠে গেল সাতজনই। নোঙর খুলে দিতেই স্রোতের টানে ভাটির দিকে ছুটল নৌকা। দাঁড় বাওয়ারও কোন প্রয়োজন হলো না।

নৌকা শহরের বাইরে চলে আসতেই দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। একে স্রোতের টান, তার ওপর চারটে দাঁড়, উড়ে চলল যেন ছোট্ট নৌকাটা।

বৃষ্টির তোড় আরও বেড়েছে। এই দুর্যোগে কেউ তাদের দেখতে পাবে না। নিশ্চিন্তে দাঁড় বেয়ে চলল অভিযাত্রীরা। কিন্তু তারা জানে না, অতটা নিশ্চিন্ত হওয়া তাদের উচিত হয়নি।

আরও আধমাইলটাক যেতেই ঘটল বিপত্তি। হঠাৎ কিসে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নৌকা। ব্যাপার কি? ভাল করে চাইতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। এরপরেও হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল সকলে। নাহ্, বাড়িয়ে বলেনি হ্যারি কিলার। ব্ল্যাকল্যান্ড থেকে পালানোর রাস্তা রাখেনি সে।

শহরের বাইরে নদীর দুই তীরে উঁচু খুঁটিতে লোহার মোটা তারের জালের আচ্ছাদন দেয়া হয়েছে। আচ্ছাদন শেষ হয়েছে শহরের বাইরে পৌনে একমাইল মত দূরে। এখানটায় এসে মোটা লোহার জাল দিয়েই বেড় দেয়া হয়েছে নদী। কাজেই নৌকা করে কিংবা সাঁতার কেটে পালানোর আশা বৃথা।

এতবড় বাধার পরও সাহস হারাল না অভিযাত্রীরা। তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু, জানা আছে ওদের। কিন্তু কি করা যায়? উঁচু মসৃণ এই জাল টপকানো একেবারেই অসম্ভব। আর ছেঁড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে কি প্রাসাদে ফিরে যাবে? হাঁটু মুড়ে বসে ক্ষমা চাইবে হ্যারি কিলারের কাছে?

না, মোটেই না। তাহলে?

প্রস্তাবটা প্রথম পেশ করল ফ্লোরেন্স, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? ফ্যাক্টরির ভেতর গিয়ে ঢুকি না কেন?'

'কিন্তু তাতে কি হবে? ফ্যাক্টরির লোকেরাও তো হ্যারি কিলারেরই অনুচর।' বারজাকের গলায় সন্দেহ।

'কে জানে, বিজ্ঞানীরা তার কথার বাধ্য নাও হতে পারে। হয়তো জোর করে

আটকে রেখে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে ওদের। দেখেননি, কেমন উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে ফ্যাক্টরির তিন দিক, নদীর দিক ছাড়া? কেন? চলুন না, কপাল ঠুকে দেখিই না কি হয়? এমনিতেও তো মরণই লেখা আছে কপালে।'

শেষ পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের কথাই রইল। দাঁড় টেনে আবার ফিরে চলল ওরা। স্রোত ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এল, কারখানাটাকে পাক মেরে নদীর তীরে এসে শেষ হওয়া পঞ্চাশ গজ চওড়া রাস্তাটার ধারে। অঝোর বর্ষণ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না ভালমত।

নৌকা থেকে নেমে এল অভিযাত্রীরা। রাস্তায় উঠল।

কয়েক গজ পরপরই উঁচু খুঁটির মাথায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। বিশ গজ দূরে ফ্যাক্টরির পশ্চিম কোণে গার্ডরুম দেখা যাচ্ছে। উত্তর কোনায়ও আছে। ভেতরে পাহারাদার আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। কে যাবে এই বৃষ্টিতে বাইরে বেরোতে? হয়তো বসে বসেই ঢুলছে।

বিশাল চওড়া রাস্তা যেখানে নদীর ধারে এসে শেষ হয়েছে, তার গজ বিশেক দূরে জেটি। কারখানার জন্যে ব্যবহৃত মালামাল আনা হয় নিশ্চয়ই এ পথে।

পাহারাদারের ভয়ে সারারাত এই বৃষ্টির মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। পা টিপে এগিয়ে চলল ওরা পশ্চিমের গার্ডরুমের দিকে। বেকায়দা অবস্থায় পাহারাদারকে কাবু করে ফেলার ইচ্ছে।

অসুবিধে হলো না। দরজা ভিড়িয়ে রেখে টুলে বসে ঢুলছিল লোকটা। সেন্ট বেরেন, টোনগ্যানে আর ফ্লোরেন্সের মিলিত আক্রমণে নিমেষে ধরাশায়ী হলো। তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো। ছাদ থেকে নেমে দড়িটা খুলে সঙ্গেই রেখেছিল ফ্লোরেন্স। কাজে লাগল এখন। পাহারাদারের পরনের কাপড় ছিঁড়েই তার মুখে ঠেসে দেয়া হলো।

কারখানার পাঁচিল ধরে সার বেঁধে এগোল ওরা। ওয়ার্কশপের দরজাটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কোথায় দরজা?

হতাশ হলো না অভিযাত্রীরা। দরজা থাকতে বাধ্য। পেল ওরা। ওয়ার্কশপের দেয়ালের সঙ্গে এক সমতলে বসানো হয়েছে পুরু ইস্পাতের দরজা। দেয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা হয়েছে, তাই প্রথমে খুঁজে পায়নি ওরা।

কিন্তু দরজা পেলেই কি? ঢোকা যাবে না। বন্ধ। ভাঙার তো প্রশ্নই ওঠে না। কামান দেগেও ভাঙা যাবে কিনা সন্দেহ।

খুঁজতে খুঁজতে বড় দরজাটার পাশেই আরেকটা ছোট দরজা পেয়ে গেল অভিযাত্রীরা। কিন্তু এটাও বন্ধ। কোথাও একটা ছোট্ট ফাঁক-ফোকর পর্যন্ত নেই। কি করা যায়?

সেন্ট বেরেন বুদ্ধি দিল, একসঙ্গে কিল-ঘুসি-লাথি মারা হোক দরজায়। কেউ না কেউ খুলবেই।

অগত্যা তাই করতে তৈরি হলো ওরা। এমনি সময় দেখল ছায়ামূর্তিটাকে। ভিজতে ভিজতে এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে। প্রহরী নয়তো?

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে পাঁচিল ঘেঁষে সার বেঁধে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

ওদের পাশ দিয়েই হেঁটে গেল মূর্তিটা। কিন্তু চোখ তুলে চাইল না পর্যন্ত। বৃষ্টিতে যে ভিজছে, সে খেয়ালও নেই যেন। বড় অদ্ভুত তো! পাগল-টাগল নাকি?

এগিয়ে গিয়ে ছোট দরজাটার সামনে দাঁড়াল লোকটা। পকেট থেকে কি বের করল। বোধহয় চাবি। আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে তালায় চাবি ঢোকাবার ফুটোটা বের করল।

ঠেলতে হলো না। তালাটা খুলে যেতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল পাল্লা। অদ্ভুত লোকটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক সাথেই ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ল অভিযাত্রীরা সবক'জন।

অবাক হয়ে চোখ তুলে চাইল লোকটা। মৃদু গলায় শুধু বলল, 'একি!'

মাথার ওপরে একটা হালকা মৃদু আলো জ্বলছে। সুইচ টিপে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল একটা আলো জ্বেলে দিল লোকটা। তারপর ভাল করে চাইল অভিযাত্রীদের মুখের দিকে।

টোনগানের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল লোকটা, 'সার্জেন্ট!'

লোকটাকে ভাল করে দেখে অবাক হয়ে গেল টোনগানেও, 'আরে! আপনি মারসেল ক্যামারেট না!'

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল জেন। তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে ছিল, এই ক্যামারেটই নয়তো!

এক পা এগিয়ে গেল ফ্লোরেন্স, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে, মঁসিয়ে ক্যামারেট।'

ফিরে চাইলেন ক্যামারেট, 'বেশ।'

বলেই সুইচবোর্ডের আরেকটা বোতাম টিপে ধরলেন। নিঃশব্দে খুলে গেল সামনে পাঁচ গজ দূরে দেয়ালের গায়ে একটা দরজা। সার সার সিঁড়ি উঠে গেছে উপর দিকে। আলোয় ঝলমলে।

'আসুন।' সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ক্যামারেট, 'পরে কথা হবে।'

তাঁর কথা শুনে মনে হলো এর চেয়ে সহজ কাজ যেন আর দুনিয়ায় নেই।

ছয়

অতি তুচ্ছ সৌজন্য। কিন্তু শত্রু এলাকায় এটুকুও আশা করেনি অভিযাত্রীরা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল তারা। নির্বাক, নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে চলল মারসেল ক্যামারেটের পিছু পিছু।

বিশ ধাপ পেরিয়ে একটা হলঘরে এসে দাঁড়াল তারা। এগিয়ে গিয়ে ওপাশের একটা দরজা খুলে ফিরে চাইলেন ক্যামারেট। ডাকলেন, 'আসুন।'

আরেকটা বড় ঘরে এসে দাঁড়াল অভিযাত্রীরা। কিন্তু একেবারেই অগোছাল ঘরের জিনিসপত্র। মাঝখানে বিশাল এক টেবিল। তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছাদছোঁয়া বিশাল সব আলমারি। সব বইয়ে ঠাসা। টেবিল আর কোন কোন

আলমারির সামনে রাখা মোট বারোটা কাঠের চেয়ার। সবগুলোর ওপর ফেলে রাখা হয়েছে রাশি রাশি বই। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর থেকে মাটিতে বই নামিয়ে রাখলেন ক্যামারেট। তারপর ধুলো না ঝেড়েই ধপ করে বসে পড়লেন। অভিযাত্রীরাও নিজেরাই কয়েকটা চেয়ার থেকে মাটিতে বই নামিয়ে রেখে বসল। টোনগানে আর মালিক বসল না। ইচ্ছে করেই। হাজার হোক, অত বড় বড় লোক। তাদের সামনে চেয়ারে বসে অসম্মান দেখাবে নাকি!

'তা কি করতে পারি, বলুন?' সহজ শান্তভাবে জানতে চাইলেন ক্যামারেট। কিন্তু একবারও জানতে চাইলেন না, এই দুর্যোগের রাতে বলা নেই, কওয়া নেই কটিজন অচেনা মানুষ কোথা থেকে কি করে, কি কাজে হঠাৎ উদয় হয়েছে এসে।

সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামারেটের কথার জবাব দিল না কেউ। বুঝে নেবার চেষ্টা করছে বিচিত্র এই লোকটিকে। বিশ্বাস করা যায়, কি যায় না। কিন্তু কেউই অবিশ্বাস করতে পারল না তাঁকে। সহজ ব্যবহার। চোখে-মুখে শিশুর সরলতা। বিশাল ললাট দেখলেই অসামান্য প্রতিভা আঁচ করা যায়। ভদ্র, বিনয়ী লোকটাকে কিছুতেই হ্যারি কিলারের সমগোত্র বলে মানতে পারল না অভিযাত্রীরা। ব্ল্যাকল্যান্ডে এই লোক একেবারেই বেমানান। কিন্তু তবু কি করে এখানে এসে পড়লেন মানুষটি বুঝতে পারল না তারা।

ক্যামারেটকে বিশ্বাস করা যায় বুঝতে পেরে কথা বললেন বারজাক, 'আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি আমরা, মঁসিয়ে ক্যামারেট। আমাদের সাহায্য করবেন?'

'মনে হচ্ছে কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে চাইছে। কে?' একটু অবাক মনে হলো ক্যামারেটকে।

'এই ব্ল্যাকল্যান্ডের অত্যাচারী মাস্টার হ্যারি কিলার।'

'হ্যারি কিলার! অত্যাচারী!' যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না ক্যামারেট।

'জানেন না?' ক্যামারেটের মতই অবাক হলেন এবার বারজাক।

'না তো!'

'এই শহরটার নাম ব্ল্যাকল্যান্ড, তা নিশ্চয় জানেন।' ক্ষীণ ব্যঙ্গ বারজাকের কণ্ঠে।

কিন্তু টেরই পেলেন না ক্যামারেট। সহজ গলায়ই বললেন, 'না। বিশ্বাস করুন, এই প্রথম শুনলাম আপনার মুখে। তাছাড়া কোথায় কোন্ শহর কি নাম অত খবর রেখে আমার দরকারই বা কি?'

'বেশ, বেশ,' পরিষ্কার শ্লেষ এবার বারজাকের গলায়, 'শহরের খবর না হয় নাই রাখলেন। কিন্তু যে কোন শহরে লোকের বাস থাকে, এটা নিশ্চয় জানেন?'

'লোক তো থাকবেই।'

'আর লোক থাকলেই এ যুগে শাসন ব্যবস্থা থাকে, থাকে সরকার। নাকি?'

'থাকবেই। খুব স্বাভাবিক।'

'বেশ। এই ব্ল্যাকল্যান্ডেরও সরকার আছে। আর তার শাসক হ্যারি কিলার। পিশাচ, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী মাতাল এবং পাগল।'

'এমন ভাবে কথা বলছেন আপনি···।' বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ক্যামারেট

বাধা পেয়ে।

খেপে গেছেন বারজাক। 'ওর মত একটা রক্তলোলুপ পশুর উদ্দেশে অনেক ভদ্র ভাষা ব্যবহার করছি। ও যা করেছে, তার তুলনায় কিছুই না। তার আগে আমাদের পরিচয়টা জানানো দরকার।'

একে একে চেয়ারে বসা সবার পরিচয় দিয়ে গেলেন বারজাক। আসল পরিচয়ই, শুধু জেন ব্লেজনেরটা ছাড়া। এসব শোনার যেন কোন আগ্রহই নেই ক্যামারেটের, এমনি উদাসীন হয়ে রইলেন।

টোনগানের দিকে ফিরে বললেন বারজাক, 'একে তো চেনেনই।'

'চিনি···চিনি···।'

'আপনার দেশ কোথায়? যা মনে হচ্ছে ফ্রান্সেই, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।' কোন ভাব পরিবর্তন নেই বিজ্ঞানীর গলায়।

'নাইজার বেন্ডে একটা মিশন এসেছে ফরাসী সরকারের নির্দেশে। বারজাক মিশন। এবং সেই মিশনের নেতা আমি। আমার সহযোগী এঁরা। পদে পদে আমাদের বাধা দিয়ে এসেছে পিশাচ হ্যারি কিলার। ফলে অশেষ কষ্ট পেতে হয়েছে আমাদের। অথচ ওর কিছুই করিনি আমরা। এখানে আমাদের নিয়ে আসার আগে তার নামও শুনিনি।'

'কিন্তু কেন? বাধা দেবে কেন?' প্রতিবাদ করতে চাইলেন যেন ক্যামারেট। এই প্রথম সামান্য আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর কথায়।

'যাতে তার শয়তানীর রাজত্বের খোঁজ না পায় বাইরের দুনিয়া।'

'হোয়াট? বলছেন কি?' সোজা হয়ে বসেছেন ক্যামারেট। 'বাইরের দুনিয়া মানে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের মত দেশ এই শহরের খবর জানে না বলছেন। হতেই পারে না। আমার কারখানার দেশে ফিরে যাওয়া কর্মচারীরা নিশ্চয় বলেছে।'

'না। বলেনি। আসলে দেশে যেতেই পারেনি তারা। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার নাম করে খুন করে তাদের লাশ মরুভূমিতে ফেলে দেয়া হয়েছে হ্যারি কিলারেরই আদেশে।'

'অ্যাঁ! এমন একটা শহরের খবর বাইরের দুনিয়ার কেউ জানে না? কেউ শোনেনি মরুভূমিতে চাষাবাদের খবর? বলছেন কি আপনি?' ক্যামারেটের উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমেই।

'বললাম তো কেউ শোনেনি। জানে না।'

'শোনেনি না?'

'না।'

উঠে দাঁড়ালেন ক্যামারেট। পায়চারি করতে শুরু করলেন ঘরের এদিক থেকে ওদিক। গম্ভীর হয়ে উঠেছে মুখ চোখ। বিড় বিড় করছেন, 'কিন্তু অমন তো হবার কথা ছিল না···কেন করল সে অমন···'

কয়েক মিনিট পরেই সামলে নিলেন ক্যামারেট। আবার গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। বারজাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর?'

'পথে আমাদের ওপর সে কত ধরনের অত্যাচার করেছে, তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে নেই আমার। শুধু শুনে রাখুন, পদে পদে বাধা

দিয়েও যখন কিছুতেই ঠেকাতে পারল না, একদিন রাত দুপুরে ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। আজ চোদ্দদিন হলো এই শহরে ধরে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছে আমাদের। হুমকি দিয়েছে, আর ষোলো দিন পরেই ফাঁসী দেবে।'

লাল হয়ে উঠেছে ক্যামারেটের মুখ। শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল।

'এমন কাজ করবে হ্যারি কিলার?'

'শুধু করবে নয়, এর চেয়েও সাংঘাতিক কাজ ইতিমধ্যে আমাদের চোখের সামনেই করে বসে আছে।' বলে একে একে কি করে জেনের ওপর মানসিক অত্যাচার চালিয়েছে হ্যারি কিলার, কি করে নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্যে নীরিহ দু'জন নিগ্রোকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে জানালেন বারজাক।

শুনে বোবা হয়ে গেলেন যেন ক্যামারেট। এই প্রথম চিন্তার জগৎ ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এসেছেন তিনি। রক্তজমাট করা নিষ্ঠুরতার বর্ণনা শুনে শিউরে উঠলেন। তাঁর মত একজন সরল লোক একটা ভয়ঙ্কর খুনীর সংস্পর্শে কাটিয়েছেন দশ দশটা বছর, জেনে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। প্রচণ্ড বিবেক দংশন শুরু হয়ে গেছে।

'এই শহরে এসেই অন্যায় অত্যাচার শুরু করেনি হ্যারি কিলার। আগেও নিশ্চয় করেছে। জানেন কিছু আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন বারজাক।

'আমি, আমি জানব কি করে?,জানলে তার সঙ্গে আসতাম নাকি?' প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন ক্যামারেট। 'ফ্যাক্টরি নিয়ে থাকি দিনরাত। বাইরের কোন খবরই রাখার সময় হয়ে ওঠে না। কোনদিন হ্যারি কিলারের কাণ্ডকারখানার কিচ্ছু দেখিনি, শুনিনি, জানি না।'

'তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দিন দয়া করে। এখানে আসা অবধি ব্ল্যাকল্যান্ডের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মাথা ঘুরে গেছে আমাদের। দশ বছর আগেও যেখানে ভয়ঙ্কর মরুভূমি ছিল, সেখানে আজ শ্যামল মাঠ। হয়তো এককালে ব্রেন ছিল হ্যারি কিলারের, কিন্তু এখন বিন্দুমাত্রও নেই। মদে খেয়েছে। তাহলে এই বিস্ময়ের স্রষ্টাটি কে?'

'এমন একজন, হ্যারি কিলারের সঙ্গে যার তুলনা চলে না।' আঁতকে উঠে বললেন যেন ক্যামারেট।

'কে?'

'আমি, আবার কে?' অহঙ্কারে ফুলে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'এ সমস্তেরই স্রষ্টা আমি। মরুর আকাশে অঝোর কালো মেঘ সৃষ্টি করেছি, বৃষ্টি ঝরিয়েছি ধু-ধু বালির বুকে। করে তুলেছি ফসল সৃষ্টির উপযুক্ত। মহাকাশে বসে ঈশ্বর যেমন দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, এই ফ্যাক্টরিতে বসে আমিও ব্ল্যাকল্যান্ডকে সৃষ্টি করেছি।'

উপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন ক্যামারেট। যেন নিজের সমকক্ষ কেউ আর আছে কিনা, চ্যালেঞ্জ করছেন। অভিযাত্রীদের এই প্রথম আশঙ্কা হতে লাগল, আরেক পাগলের পাল্লায় এসে পড়েছে। উসখুস করে উঠল সবাই। নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

এই প্রথম কথা বললেন ডক্টর চাতোন্নে। কণ্ঠস্বর ধারাল, 'নিজের হাতে এতসব সৃষ্টি করে কোন্ আক্কেলে সব সঁপে দিলেন খুনী হ্যারির হাতে? আপনার সৃষ্টিকে সে

কোন্ কাজে লাগাবে ভাবেননি কেন একটুও?'

'সৃষ্টি করার আগে জগতের কি হবে, ভেবেছিলেন ঈশ্বর?'

'নিশ্চয় ভেবেছিলেন। কারণ শাসন আর বিচারের ভারটা তিনি নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন।'

'আমারও আছে। হ্যারি কিলারের পাপের সাজা আমি দেব,' চোখ দুটো জ্বলে উঠল ক্যামারেটের। অসুস্থ দ্যুতি। রীতিমত ঘাবড়ে গেল অভিযাত্রীরা। প্রতিভাবান ঠিকই, কিন্তু মানুষটা পাগল, বুঝে নিল তারা। এমন লোকের ওপর ভরসা করা কি ঠিক হবে?

চিরকালই বাস্তববাদী আমিদী ফ্লোরেন্স। প্রথমবারেই কাজের কথায় চলে এল, 'হ্যারি কিলারের সঙ্গে কি করে পরিচয় আপনার? আর এই ব্ল্যাকল্যান্ড সৃষ্টির পরিকল্পনাই বা মাথায় ঢুকল কি করে?'

'পরিকল্পনা হ্যারি কিলারের। রূপ দিয়েছি আমি।' আস্তে আস্তে আবার শান্ত হয়ে এসেছেন ক্যামারেট। 'একটা ইংলিশ সৈন্যবাহিনী এদিকে এসেছিল জর্জ ব্লেজন নামে এক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে। আমি ছিলাম সেই দলে।'

নামটা শুনেই সব চোখ এসে পড়ল জেনের ওপর। কিন্তু মুখের ভাব একটুও বদলায়নি মেয়েটার।

'ওই সেনাবাহিনীতেই ছিল সার্জেন্ট টোনগানে। দেখলেন না, দেখেই চিনেছি। আমি ছিলাম এঞ্জিনিয়ার। পর্বত সম্বন্ধীয় ভূগোল অরগ্রাফি, পানি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হাইড্রোগ্রাফি আর খনিজ বিজ্ঞান, মিনারোলজী নিয়ে গবেষণায় এসেছিলাম। আশান্তিল্যান্ডের আসিরা থেকে রওনা দেবার দু'মাস পরে একদিন আমাদের দলে এসে যোগ দিল হ্যারি কিলার। কোত্থেকে কে জানে! আশ্চর্য! তাকে সাদরে দলে ডেকে নিলেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন।'

'আর সেই দিন থেকে আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেন ব্লেজনের জায়গা দখল করে নিল হ্যারি কিলারই, না? ব্যাপারটা খেয়ালও করেনি নিশ্চয়ই দলের কেউ?' জিজ্ঞেস করল জেন।

'ঠিক বলতে পারব না। নিজের কাজে মশগুল থাকতাম তো। কিন্তু একদিন আটচল্লিশ ঘণ্টা বাইরে থেকে ফিরে আসার পর দেখলাম, আমার ক্যাম্প, যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। ক্যাপ্টেন ব্লেজন নেই। আছে শুধু বিশজন লোক নিয়ে হ্যারি কিলার। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ক্যাপ্টেন নাকি সমস্ত লোকলস্কর নিয়ে উপকূলের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানাল কিলার। কি আর করা। চললাম তার সঙ্গে। কয়েক দিন ধরেই একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। একদিন আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম হ্যারি কিলারকে। মরুভূমিতে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানো যায়। শুনে তো একেবারে লাফিয়ে উঠল সে। বলল, টাকাপয়সা যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা সেই করে দেবে। আমি শুধু একমনে কাজ করে যাব। এরপরই চলে এলাম সাহারার এই এলাকায়। সৃষ্টি করলাম ব্ল্যাকল্যান্ড, অবশ্যই হ্যারি কিলারের প্ল্যান মাফিক।'

'আসলে কি করেছে সে জানেন?' বলল জেন, 'কোনক্রমে ক্যাপ্টেন ব্লেজনকে কব্জা করে সেনাবাহিনীকে তাঁর হয়ে আদেশ দিয়ে গেছে হ্যারি কিলার। খুন-জখম-

রাহাজানি চালিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীটিকে পরিণত করেছে দস্যুবাহিনীতে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়েছে, সমানে মানুষ জবাই করেছে।'

'অসম্ভব। আমার চোখে পড়েনি কেন তাহলে?' প্রতিবাদ জানালেন ক্যামারেট।

'কোন্ জিনিসটাই আপনার চোখে পড়েছে? এখানে তো দশ বছর ধরে আছেন কিন্তু শহরের নামটা জানেন না আজও। অথচ বলছেন এই শহর আপনারই সৃষ্টি।'

'তা···তা···ঠিকই বলেছেন। আসলে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না আমার।' আমতা আমতা করে বললেন ক্যামারেট।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আবার আগের কথার খেই ধরল জেন, 'ক্যাপ্টেন জর্জের সেনাবাহিনীর কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ইউরোপে। খবর পৌঁছুল ইংল্যান্ডে, বিদ্রোহী হয়েছেন ক্যাপ্টেন জর্জ। তাঁকে দমন করার জন্যে সৈন্য পাঠানো হলো। তারা তাঁর দলবলকে ঠাণ্ডা করে ফিরে গেল দেশে। ঘোষণা করল গিয়ে, গোলাগুলিতে মারা গেছেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু আসলে তা নয়। যুদ্ধ চলার সময়েই তাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন!'

'খুন। ছুরি মেরে। পেছন থেকে।'

'ছুরি মেরে?'

'হ্যাঁ, ছুরি মেরে। জানেন আমি আসলে কে? ক্যাপ্টেন জর্জের ছোট বোন আমি। সারা ইউরোপে ভাইয়ার নাম শুনলে এখন নাক সিটকায় লোকে। লজ্জায় অপমানে হেঁট হয়ে গেছে বাবার মাথা। তাই আমি এসেছি, ভাইয়া যে নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে। আমার ভাই দেশদ্রোহী হয়েছে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি আমি কথাটা। এসে দেখলাম, ঠিকই ভেবেছি।'

'ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে!' আপন মনেই বিড় বিড় করছেন ক্যামারেট।

'যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে ভাইয়াকে, তার ফলাটা লাশের গায়ে বেঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাঁটটা পাওয়া গেছে ভাঙা অবস্থায়। গায়ে খোদাই করা দুটো অক্ষর শুধু পড়া যায়। হত্যাকারীর নামের দুটো অক্ষর। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন জানি। হত্যাকারী হ্যারি কিলার।'

'হোয়াট?' উত্তেজনায় আবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ক্যামারেট।

'ঠিকই বলছি আমি, মঁসিয়ে ক্যামারেট।'

'অথচ দেখুন, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে থেকেও এর বিন্দুবিসর্গ জানি না আমি।' আবার বেসামাল চাহনি ফুটে উঠেছে ক্যামারেটের চোখের তারায়।

'কিন্তু আসল কথা জানতে চাইছি আমরা। সাহায্য করবেন তো আমাদের?' জানতে চাইছেন বারজাক।

'করব না মানে? এটা আবার জিজ্ঞেস করছেন?' জ্বলে উঠলেন ক্যামারেট। ব্যাপারটা তাঁর স্বভাবের একেবারে উল্টো। 'আপনারা ভেবেছেন, এত কথা জানার পরও হ্যারি কিলারের গুণগান গাইব আমি? ভয়ঙ্কর সাজা আমি দেব তাকে। ভয়ঙ্কর।'

'শুনে সুখী হলাম,' ফস করে বলে বসল বাস্তববাদী ফ্লোরেন্স, 'সাজা পরে

দেবেন। আগে পিশাচটার খপ্পর থেকে তো বাঁচান আমাদের।'

সহজভাবে হাসলেন ক্যামারেট। আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন।

'আমার কাছে যখন এসে পড়েছেন, একটা চুলও আর ছুঁতে পারবে না আপনাদের হ্যারি কিলার। সে এখনও জানে না আপনারা এখানে, আর জানলেও কোন ক্ষতি নেই।'

আবার চেয়ারে বসে টেবিলে বসানো একটা বোতাম টিপলেন ক্যামারেট।

ঘরে এসে ঢুকল একজন নিগ্রো চাকর।

'জ্যাকো, এঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করো,' আদেশ দিলেন ক্যামারেট। তারপর অতি স্বাভাবিক ভাবে চেয়ার থেকে উঠে অভিযাত্রীদের 'গুড নাইট' জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল জ্যাকো। খাওয়ার ব্যবস্থা যা হোক করতে পারবে, কিন্তু ফ্যাক্টরির ভেতরে অতিথি থাকার নিয়ম নেই। তাছাড়া শোবার মত ঘরও নেই। অত রাতে কর্মচারী বা শ্রমিকদের ডেকে তোলা সম্ভব?

জ্যাকোর মুখ দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন বারজাক। বললেন, 'থাক, থাক, আমাদের থাকা নিয়ে অত ভাবতে হবে না তোমাকে। ভাবছ যে মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। রাতটা চেয়ারে বসে এ ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারব। শুধু কয়েকটা চাদর এনে দিতে পারবে?'

ঘাড় কাত করল জ্যাকো। পারবে।

সকাল বেলা এসে অভিযাত্রীদের এঘরে দেখে মোটেই অবাক হলেন না ক্যামারেট। রাতটা কোথায় কাটিয়েছে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। জ্যাকোর ওপর দায়িত্ব দিয়েই সন্তুষ্ট তিনি। রাতে যাবার আগে যেমন জানিয়েছেন, এখন এসেও তেমনি স্বাভাবিকভাবেই 'গুড মর্নিং' জানালেন। তারপর চেয়ারে বসেই কথা শুরু করলেন, 'জেন্টলমেন, এখুনি এই পরিস্থিতির একটা বিহিত করতে হবে।'

বলেই বোতাম টিপলেন ক্যামারেট। সমস্ত ফ্যাক্টরিতে বেজে উঠল এলার্ম বেল। উঠে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী। অভিযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

অসংখ্য গলিঘুঁজি আর আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে একটা বিশাল হলঘরে এসে পৌঁছল অভিযাত্রীরা। সারি সারি মেশিনের কোনটাই চলছে না। সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বেল শুনেছে ওরা। ক্যামারেটেরই অপেক্ষা করছে।

'সবাই এসেছে তো, রিগড?' সামনে দাঁড়ানো একজনকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যামারেট।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল রিগড।

'বেশ। রোলকল করো।'

রোলকল করে দেখা গেল সবাই হাজির।

আটজন নবাগতের পরিচয় দিলেন ক্যামারেট নিজের লোকদের কাছে। তারপর একে একে বলে গেলেন কাল রাতে শোনা হ্যারি কিলারের পৈশাচিকতার,

কাহিনী। অভিযাত্রীদের মুখে যা যা শুনেছেন, একটা কথাও বাদ দিলেন না। স্তম্ভিত, বিমূঢ় হয়ে সব কথা শুনে গেল ফ্যাক্টরির লোকেরা। প্রতিটি কথা বিশ্বাস করল। ডিরেক্টর ক্যামারেটকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে তারা। অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।

সব কথা গুছিয়ে বলার পর ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিলেন ক্যামারেট, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, না জেনে একটা খুনে ডাকাতের সাগরেদি করে এসেছি এতদিন আমরা। জান দিয়ে খাটছি আমরা লোকের উন্নতি হবে বলে, অথচ আমাদের শক্তিকে কুকাজে লাগাচ্ছে হ্যারি কিলার। এর বিহিত করতেই হবে। তাছাড়া বারজাক মিশনের কোন সদস্যকেই আটকে রাখার ক্ষমতা বা অধিকার ওই খুনে হ্যারিটার নেই। যে করেই হোক বারজাক মিশনের সদস্যদের নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতেই হবে আমাদের।'

অবাক বিস্ময়ে মার্সেল ক্যামারেটের কথা শুনছে শ্রমিক কর্মচারীরা। একটা কথাও বলছে না কেউ। নীরব সম্মতির লক্ষণ।

আসল খবরটা দিলেন ক্যামারেট সবার শেষে, 'সবচেয়ে আশ্চর্য এবং দুঃখের কথা কি জানেন? ইউরোপ বা বাইরের দুনিয়ার কেউ জানে না, এমন একটা শহর আছে মরুভূমির বুকে। অথচ এতদিন কি অহংকারই না করেছি মনে মনে, আজব এক শহর বানিয়ে তাজ্জব করে দিয়েছি দুনিয়াকে। অথচ ভেবে দেখুন, কেউ শোনেইনি আজ পর্যন্ত। এদিক দিয়ে এমনিতেই কোন সদাগরী কাফেলা যায় না। কালেভদ্রে যদিও বা কোন ভ্রমণকারী ভুল করে এসে পড়ে তো আর ফিরে যেতে পারে না। খুন করে, কিংবা ধরে এনে যাবজ্জীবন কারাগার দেয় তাকে হ্যারি কিলার। হয়তো ভাবছেন, বাইরের লোক না-ই এল, আমাদের অনেক শ্রমিক কর্মচারী বা বিজ্ঞানী তো দেশে ফিরে গেছে? তাদের মুখে তো এই বিস্ময়কর খবর প্রচার হবার কথা? হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কারণ? কারণ তাদের একজনও দেশে ফিরে যেতে পারেনি। কাল এঁদের কাছে সব শোনার পর হিসেব করে দেখলাম, মোট সাঁইতিরিশজন লোক এই ফ্যাক্টরি থেকে চলে গেছে। না, দেশে ফিরে যায়নি তাদের কেউ। এখানেও কোথাও নেই। কোথায় আছে জানেন? সাহারার কোন অঞ্চলের ধু-ধু বালির তলায়। মৃত। হ্যাঁ, খুন করা হয়েছে তাদের। হ্যারি কিলারের নির্দেশে।' বলেই সবার মুখের দিকে চাইতে লাগলেন ক্যামারেট।

এতক্ষণ শুধু বিস্মিত হয়েছিল ফ্যাক্টরির লোকেরা। এবার বজ্রাহত হলো যেন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে সব ক'জনেরই।

অতি সুন্দরভাবে কথা শেষ করলেন খেপা বিজ্ঞানী, 'আমাদের পরিণামটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর কেউ কোনদিন দেশে ফিরে যেতে পারছি না, এর কোন বিহিত না করতে পারলে। সুতরাং একটাই উপায় আছে। হ্যারি কিলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করব। আপনি যা বলবেন তাই করব। দরকার হলে জীবনের বিনিময়ে।' সমস্বরে চিৎকারে ফেটে পড়ল ঘরের সবাই।

'গুড। ভেরি গুড।' বললেন ক্যামারেট, 'আমি জানতাম, আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না কেউ। এখন যান, যে যার কাজ করতে যান। হ্যারি কিলারের বিরুদ্ধে

যা করার আমিই করব। আপনারা শুধু সাহায্য করে যাবেন আমাকে।'

আশ্চর্য! আর একটা টুঁ শব্দও না করে একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। এ থেকেই বোঝা যায় মার্সেল ক্যামারেটের ওপর তাদের আস্থা কি অপরিসীম।

রিগডকে থাকতে বললেন ক্যামারেট। আর সবাই চলে যেতে তাকে নিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন তিনি। দু'জনের পিছু পিছু এল অভিযাত্রীরা।

রিগড আর অভিযাত্রীদের নিয়ে নিজের ঘরে এলেন ক্যামারেট। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বেজে উঠল টেলিফোন।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন বিজ্ঞানী, 'মার্সেল ক্যামারেট!'

ওপাশ থেকে কি কথা শুনে প্রথমে বললেন, 'হ্যাঁ' তারপর 'না', এবং সবার শেষে, 'আপনার ইচ্ছে।' বলে রিসিভার রেখে দিলেন।

কোনরকম উত্তেজনাই নেই ক্যামারেটের মধ্যে। অভিযাত্রীদের দিকে ফিরে স্বাভাবিক ভাবেই জানালেন, 'হ্যারি কিলার। এখানে এসেছেন আপনারা, জেনে গেছে ইতিমধ্যেই।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠলেন যেন বারজাক। 'কি করে?'

'চৌমৌকি নামে একটা লোককে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আপনারাই নাকি বেঁধে ফেলে রেখে এসেছেন। নদীতে একটা নৌকা ভাসতে দেখা গেছে, ফ্যাক্টরির কাছাকাছি। শহরের বাইরে আপনারা নেই। ভেতরেও না। সুতরাং একটা জায়গায়ই থাকবেন, ফ্যাক্টরি। হ্যারি কিলার জিজ্ঞেস করতে স্বীকার করলাম, আছেন। ফিরিয়ে দিতে বলল। অস্বীকার করলাম। গায়ের জোরে ধরে নিয়ে যাবে বলল। যা ইচ্ছে করতে পারে বললাম। ঠিক বলেছি তো?' হাসলেন ক্যামারেট।

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন বারজাক, 'একটা কাজ করবেন? বন্দুক আছে? দেবেন?'

'বন্দুক নেই।' হাসলেন ক্যামারেট। 'ওসবের দরকারও নেই।'

'মানে? বাধা দিলেই গোলাগুলি ছুঁড়বে ওরা! রুখবেন কি করে? তাছাড়া প্যালেসের ছাদ থেকে কামান দাগলে?'

'সব কিছু রোখার ক্ষমতা আছে আমার। ইচ্ছে করলে চোখের পলকে গোটা শহরটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি আমি। কিন্তু অতটা করার কোন ইচ্ছে নেই। আর প্যালেস থেকে কামান দাগবে না হ্যারি কিলার, নিশ্চিন্ত থাকুন। সে জানে, তার শহরের প্রাণকেন্দ্র এই ফ্যাক্টরি। এটাকে ধ্বংস করার মত বোকা সে নয়। কৌশলে কাজ সারতে চাইবে। কিন্তু আমার ক্ষমতার কাছে সে তুচ্ছ।'

রিগডের দিকে ফিরে কি একটা আদেশ দিলেন ক্যামারেট। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল ফোরম্যান। মিনিটখানেক পরেই পায়ের তলা থেকে একটা চাপা গুম গুম শব্দ ভেসে এল।

ভুরু কুঁচকে ক্যামারেটের দিকে চাইলেন বারজাক।

হাসলেন বিজ্ঞানী, 'না, রিগড কোন কিছু করেনি এখনও। শব্দটা আসছে নিচতলা থেকে। ফ্যাক্টরিতে ঢোকার লোহার কবাট ভাঙতে চাইছে কেউ। হ্যারি কিলারেরই লোক আর কি। কিন্তু ক্ষমতা নেই।'

'কামান নিয়ে আসে যদি?' কিছুতেই যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না বারজাক।

'খামোকাই বোঝা বওয়ার কষ্ট করবে। এবং ভীষণ কষ্ট। কারণ প্রাসাদ থেকে এখান পর্যন্ত কামান আনার মত কোন সোজা পথ নেই। কাজেই নাকের পানি চোখের পানিতে এক হবে বেচারারা। তাই প্রথমেই ওকাজ না করে কবাট ভাঙতে চাইবে। এবং আগামী একশো বছরেও একচুল নড়বে না কবাট।' বলেই ডাকলেন ক্যামারেট, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ক্যামারেটের পিছু পিছু চলল অভিযাত্রীরা। উত্তেজনা আর কৌতূহলে ফেটে পড়তে চাইছে। নিষ্ঠুর দুর্ধর্ষ হ্যারি কিলার খেপেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে কি পারবেন এই প্রতিভাবান সহজ সরল মানুষটি?

মেশিন ঘরে কাজ বন্ধ। জোট বেঁধে আলোচনায় মশগুল কর্মচারী শ্রমিকেরা। ওদের দিকে ফিরেও চাইলেন না ক্যামারেট। এগিয়ে চললেন।

অসংখ্য ছোট-বড়, সোজা-বাঁকা করিডর পেরিয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ফ্যাক্টরি টাওয়ারের প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছুল অভিযাত্রীরা ক্যামারেটের পিছু পিছু। এই ধরনের টাওয়ারে চড়েছেন আগেও তাঁরা। প্রাসাদের টাওয়ার। কিন্তু এটা আরও অনেক বেশি উঁচু। এখানেও একটা সাইক্লোসকোপ আছে, হ্যারি কিলারেরটার চাইতে বড়।

'এই সাইক্লোসকোপ দিয়ে শুধু দূরে নয়, কাছেও দেখা যায়। ফ্যাক্টরির পাঁচিলের তলা পর্যন্ত একেবারে পরিষ্কার দেখা যায়। কিছুই না কিন্তু ব্যাপারটা। গোটা কয়েক বিশেষ ধরনের আয়নার কারসাজি।'

ক্যামারেটের কথা ঠিকই। এসপ্ল্যানেড, জেটি আর ফ্যাক্টরির পাঁচিল বরাবর রাস্তায় লোকজন ছুটোছুটি করছে। আকারে ছোট ছবিগুলি, কিন্তু স্পষ্ট। ফ্যাক্টরির প্রধান কবাটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে শুধু-শুধু ঘাম ঝরাচ্ছে জনা বিশেক লোক। মেরি ফেলো।

'বলিনি?' অভিযাত্রীদের দিকে ফিরে চাইলেন ক্যামারেট, 'দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে ওরা।'

আরও প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টা করে অন্য পথ ধরল লোকগুলো। উঁচু উঁচু মই নিয়ে এল। ফ্যাক্টরির পাঁচিলের গায়ে ঠেকিয়ে তর তর করে বেয়ে উঠতে লাগল।

আর ঠেকানো যাবে না। ভাবলেন বারজাক। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন ক্যামারেটের দিকে। মুচকে হাসলেন বিজ্ঞানী। ফোনে ফোরম্যানকে কি নির্দেশ দিলেন। তারপর শান্তভাবে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার।

পাঁচিলের মাথায় উঠে এসেছে কয়েকজন লোক। কিন্তু পাঁচিলের মাথায় হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হলো। আঠায় আটকে গেছে যেন, এমনিভাবে পাঁচিলের মাথায় ঝুলে থেকে পা ছুঁড়তে লাগল ওরা। যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা একদল পুতুল।

'বুদ্ধুর দল।' বললেন ক্যামারেট। অভিযাত্রীদের বোঝালেন, 'তামার চাইতে একশোগুণ বেশি বিদ্যুৎ-পরিবাহক একটা কৃত্রিম ধাতু আবিষ্কার করেছি আমি। ওই ধাতু দিয়েই মোড়ানো আছে পাঁচিলের মাথা। ধাতুর পাতের মধ্যে দিয়ে অল্প ভোল্টের অলটারনেটিং কারেন্ট চালু করে দেয়া হয়েছে। ফলটা দেখতেই

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

আপনাদের প্রিয় ওয়েবসাইট Banglapdf.net এখন ডোমেইন নেইম পরিবর্তন করে BanglaPdfBoi.Com এ রুপান্তরিত হয়েছে। আপনারা সবাই নিজ নিজ বুকমার্কস পরিবর্তন করে নিবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

পাচ্ছেন।' তৃপ্তির হাসি হাসলেন বিজ্ঞানী।

ওদিকে আরেক কাণ্ড ঘটেছে। ঝুলে থেকে পা ছুড়ন্ত লোকগুলোর কাণ্ড বুঝতে না পেরে ঠিক নিচের লোকগুলো পা চেপে ধরেছিল তাদের। ব্যস, আঠার মত লেগে গেল ওদের হাত ওপরের লোকগুলোর পায়ের সঙ্গে। মুখ বিকৃত করে মইয়ের ওপরই নাচ শুরু হলো ওদেরও।

হা হা করে হাসল সেন্ট বেরেন। বলল, 'বোকাগুলোর মাথায় কিছু নেই নাকি? হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে না কেন ব্যাটারা?'

'পারলে তো?' বললেন ক্যামারেট, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখছি ওদের, একচুল নড়াতে পারবে না হাত। আরও খেল দেখাচ্ছি। মজা দেখুন।'

একটা সুইচ টিপলেন ক্যামারেট। সঙ্গে সঙ্গেই যেন কয়েকটা অদৃশ্য হাত ঠেলে দিল মইগুলোকে। ছিটকে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওগুলো, লোকসুদ্ধ। এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল মইয়ের নিচের দিকের হানাদার মেরি ফেলোরা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট লোকগুলো কিন্তু ঝুলেই থাকল পাঁচিলের মাথায়।

'ওদের হাত-পা ভাঙার জন্যে ওরাই দায়ী,' সহজ গলায় বললেন ক্যামারেট, 'আগে আক্রমণ করেছে ওরাই। তা মইগুলো পড়ল কি করে শুনবেন?'

সবাই একসঙ্গে চাইল ক্যামারেটের মুখের দিকে।

'আমার থিওরি হলো, সব শক্তিই ইথারের ভেতরে এক ধরনের কম্পন ছাড়া আর কিছুই না। যেমন, আলো এক বিশেষ ধরনের কম্পন। বিদ্যুৎও তাই। শুধু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলাদা। আমার বিশ্বাস, তাপের সঙ্গে এই বিদ্যুৎ তরঙ্গের কোন যোগাযোগ আছে। কারণটা ঠিক ধরতে পারিনি, তবে ইচ্ছেমত কম্পনটা সৃষ্টি করতে পারি ইথারের মাঝে। ওই কম্পনই মইগুলোকে ঠেলে ফেলে দেয়ার জন্য দায়ী।'

ওদিকে পাঁচিলের মাথায় ঝুলে থেকে নেচেই চলেছে লোকগুলো।

'আর আটকে রেখে লাভ নেই বোকাগুলোকে,' বলেই আরেকটা সুইচ টিপলেন ক্যামারেট।

তিরিশ ফুট ওপর থেকে কংক্রিটের পথের ওপর খাড়া পড়ল লোকগুলো। পড়েই থাকল। অত ওপর থেকে পড়ে হাড়গোড় বোধহয় আর একটাও আস্ত নেই ওদের। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে পড়ে থাকা সঙ্গীদের দূরে নিয়ে গেল মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মেরি ফেলোরা।

ক্যামারেটের ওপর অবিশ্বাস রইল না আর অভিযাত্রীদের কারোই। সবারই মুখে হাসি। মেরি ফেলোদের ভোগান্তি দেখে হেসেই খুন সেন্ট বেরেন আর টোনগানে।

এগিয়ে এসে আবার দরজা ভাঙার দিকে মন দিল মেরি ফেলোরা।

'এবার ওদের একটু শিক্ষা দেয়া দরকার,' বললেন ক্যামারেট। রিসিভার তুলে নিয়ে আবার কি নির্দেশ দিলেন রিগডকে।

অদ্ভুত একটা শব্দ উঠল টাওয়ারের গোড়ার দিকে। পরক্ষণেই চোঙার মত দেখতে আজব একটা বস্তু বেরিয়ে এল টাওয়ারের গা থেকে। ছুঁচোল মুখটা নিচের দিকে খাড়াই রেখে টাওয়ারের কাছে সরে গেল চোঙটা। এবারে দেখা গেল, চোঙের

পেছনে চারটে প্রপেলার। একটা খাড়া আর তিনটে আনুভূমিক অবস্থায়। বন বন করে ঘুরছে। মাটি থেকে কয়েকগজ শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল চোঙটা। তারপর আনুভূমিক অবস্থায়ই প্রচণ্ড গতিতে উড়ে গেল পাচিলের প্রায় গা ঘেঁষে।

ওদিকে আরেকটা চোঙ বেরিয়ে এসেছে টাওয়ারের একই জায়গা থেকে। তারপর আরেকটা। তার পেছনে আরেকটা। মোট বিশটা চোঙ-পাখি উড়ে গেল প্রথমটাকে অনুসরণ করে। একই লাইনে।

'ওয়াস্প আর্মি, মানে আমার বোলতা বাহিনী।' বোলতা শব্দটার ওপর জোর দিলেন ক্যামারেট। 'কি করে কাজ করে পরে বোঝাব। মজা দেখুন আগে!'

আবার রিসিভার তুলে নিয়ে রিগডকে আদেশ দিলেন ক্যামারেট, 'রিগড, শুধু হুঁশিয়ার করে দাও ওদের। এখন পর্যন্ত তো কোন ক্ষতি করেনি আমাদের। তাই খুব বেশি কিছু কোরো না।'

ফ্যাক্টরির বাইরে এসপ্ল্যানেডে এসে ক্রমেই আরও বেশি লোক জড় হচ্ছে। আরও কয়েকজন এসে যোগ দিয়েছে কবাটগুঁতোনো মেরি ফেলোদের সঙ্গে। 'বোলতা বাহিনীকে' দেখে ভ্রূক্ষেপ করল না তারা। ব্ল্যাকল্যাণ্ডে আজব জিনিস দেখে দেখে এখন আর কৌতূহল নেই ওদের। বড় বড় গাছের গুঁড়ির সাহায্যে সমানে কবাট ধাক্কিয়ে চলল।

সার বেঁধে মেরি ফেলোদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বোলতা বাহিনী। এসপ্ল্যানেডের ওপর দিয়ে একবার চক্কর মেরে এসে থামল কবাটের একশো গজ দূরে, শূন্যে। তারপরই গর্জে উঠল সামনের বোলতাটা। এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলিতে মেরি ফেলোদের কয়েকগজ পেছনে ধুলো উড়ল। পরক্ষণেই সরে গেল বোলতাটা। তার জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল দ্বিতীয় বোলতাটা। এটাও গুলি বর্ষণ করল। তারপর সরে গিয়ে জায়গা করে দিল, তৃতীয়টাকে।

জনা তিনেক মেরি ফেলো মারা গেল গুলি খেয়ে। কয়েকজন আহত হলো। অন্যেরা পড়িমরি করে ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। চতুর্থ বোলতাটার আর গুলী করার দরকার হলো না। চোখের পলকে নির্জন হয়ে গেছে জায়গাটা।

গুলি বর্ষণ করেই টাওয়ারে নিজের বাসায় ফিরে এসেছে প্রথম তিনটে বোলতা। গুলি ভরে নিয়েই ফিরে এসে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অন্য সতেরোটা বোলতার পেছনে। একেবারে পাকা ট্রেনিং পাওয়া যেন।

নিজের চোখকেও যে বিশ্বাস করতে পারছে না অভিযাত্রীরা। একবার নিচের দৃশ্যের দিকে একবার ক্যামারেটের দিকে তাকাচ্ছে ওরা চোখ বড় বড় করে। আজব এই মানুষটার সৃষ্ট বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কাণ্ড-কারখানা দেখে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেছে তারা।

'বোকা পাঁঠাগুলোকে নিয়ে আর মাথা ঘামানোর দরকার নেই,' অভিযাত্রীদের দিকে ফিরে বললেন ক্যামারেট, 'চলুন, ফ্যাক্টরির ভেতরটা ভাল করে দেখাই আপনাদের। তবে তার আগে ফ্যাক্টরির নকশাটা দেখে নিন।'

সাত

'চওড়ায় আড়াইশো গজ কারখানা এলাকা,' বললেন ক্যামারেট, 'লম্বায় তিনশো ষাট, রেড রিভারের তীর বরাবর। আয়তক্ষেত্রাকার। মোট জমি ষাট বিঘে। এই আয়তক্ষেত্রের পশ্চিমে প্রায় ছত্রিশ বিঘে জুড়ে শুধু সব্জীখেত, বাগান ইত্যাদি।'

'কিন্তু খেত, বাগান কেন?' প্রশ্ন করল ফ্লোরেন্স।

'বাহ্! সব্জী খায় না লোকে?'

'ও।'

'ফ্যাক্টরির লোকের খাবার জন্যে কিছুটা জন্মানো হয় এখানেই, বাকিটুকু আসে বাইরে থেকে। জেটির গা ঘেঁষে প্রায় একশো গজ চওড়া আর আড়াইশো গজ লম্বা ওয়ার্কশপ। টাওয়ারের ঠিক তলায়ই আমার কোয়ার্টার। দুই প্রান্তে ষাট গজ করে চওড়া দুই টুকরো জমিতে ওয়ার্কার আর টেকনিশিয়ান এঞ্জিনীয়ারদের কলোনি। সর্বমোট একশো বিশটা ফ্ল্যাট।'

'লোকের সংখ্যা কত?' জানতে চাইলেন বারজাক।

'শ্রমিক আর কর্মচারী একশো। কয়েকজন আবার বিবাহিত। বাচ্চাকাচ্চাও আছে।' একটু থেমে নকশার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওয়ার্কশপটা একতলা। দেয়ালে কায়দা করে পুরু মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে জন্মানো হয়েছে বিশেষ ধরনের ঘাস। রাইফেল-বন্দুক তো দূরের কথা, কামানের গোলাও বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না এই দেয়ালের ওপর। নকশাটা তো দেখলেন। চলুন যাই এবার। নিচের তলায় অন্য সব জিনিস দেখাব।'

নিচে নামার আগে ফ্যাক্টরির বাইরের পরিস্থিতিটা একবার উঁকি মেরে দেখে নিল ফ্লোরেন্স। এখনও সার বেঁধে উড়ছে বোলতা বাহিনী। আক্কেল হয়ে গেছে হানাদারদের। তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে। দেখে, আশ্বস্ত হলো সে।

প্রথমেই 'বোলতা-কলোনিতে' নিয়ে গেলেন অভিযাত্রীদের ক্যামারেট। টাওয়ারের একেবারে গোড়ায় জায়গাটা। বোলতাদের রাখার জন্যে সারি সারি খুদে ঘর নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি ঘরে প্রচুর গোলাবারুদ মজুত আছে। এসব দেখে একে একে পেরিয়ে এল তারা অসংখ্য ছোট ছোট ওয়ার্কশপ। যেমন, ফিটিংশপ, প্রেস-মেশিন, কামারশালা, ফাউন্ড্রি এবং এমনি সব আরও নানা ঘর। তারপর বেরিয়ে এল বাগানে। বাগানের পরেই পাঁচিল, এবং তারপরে হ্যারি কিলারের প্যালেস, টাওয়ার।

সবে বাগানে নেমেছে, হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হলো অভিযাত্রীদের। কামান দাগা হয়েছে প্যালেস টাওয়ার থেকে। অভিযাত্রীদের কাছে থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাগানেই পড়ল গোলাটা। পড়িমরি করে ফ্যাক্টরির ভেতরে এসে ঢুকল আবার সবাই।

খেপে গেলেন ক্যামারেট। দেয়ালে বসানো টেলিফোন রিসিভার তুলে নিয়ে কি

আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে তীক্ষ্ণ একটা হিসহিস শব্দ উঠল। আধ মিনিট অপেক্ষা করলেন বিজ্ঞানী, তারপর আবার অভিযাত্রীদের নিয়ে বাইরে এলেন। আঙুল তুলে দেখালেন প্যালেসের দিকে। সবাই চাইল সেদিকে। কিন্তু আশ্চর্য! মাত্র মিনিটখানেক আগেও যেখানে ছিল টাওয়ারটা, এখন আর নেই। ভোজবাজির মত হাওয়া হয়ে গেছে।

মুচকে হেসে বললেন বিজ্ঞানী, 'আকাশ টর্পেডোর কাজ। হ্যারি হারামজাদার খানিকটা শিক্ষা হবে। পরে অবশ্য আরেকটা সাইক্লোস্কোপ বানিয়ে দেব ওখানে। অবশ্যই আমার কথা শুনলে।'

'আপাতত আরও গোটাকয়েক টর্পেডো ছুঁড়ুন না ওদিকে।' বলল আমিদী ফ্লোরেন্স।

সাংবাদিকের দিকে চাইলেন ক্যামারেট। চোখে অনিশ্চয়তার ছায়া।

'নিজের সৃষ্টি···নষ্ট করে ফেলব!'

বুঝল ফ্লোরেন্স নিতান্ত বাধ্য না হলে ব্ল্যাকল্যান্ডের কিছুই নষ্ট করবেন না ক্যামারেট। তাই আর কথা বাড়াল না সে।

হঠাৎই অস্বাভাবিক নীরব হয়ে গেছে চারদিক। শিক্ষা হয়ে গেছে হ্যারি কিলারের। প্যালেসের হৃৎপিণ্ড টাওয়ারটাই গেছে।

বাগান পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল অভিযাত্রীরা। দরজা খুলে ঢুকলেন ক্যামারেট, পেছনে পেছনে অন্যেরা।

সবাই ঢুকতে ক্যামারেট বললেন, 'একটা মজার জিনিস দেখাব এবার আপনাদের। এটা আগে পাওয়ার হাউস ছিল আমার। মোটর, স্টীম ইঞ্জিন আর বয়লার চালু থাকত সারাক্ষণ। অন্য কোনরকম জ্বালানি পাওয়া যেত না তো, কাঠ পুড়িয়েই বয়লারের খাদ্য জোগান দেয়া হত। এক মহা ঝামেলার ব্যাপার ছিল মরুভূমি পেরিয়ে অনেক দূরের জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে হত। আর তাও দু'এক মণ হলে এক কথা ছিল। লাগত হাজার হাজার মণ। আকাশ থেকে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানোর পরই শুধু এ সমস্যার সমাধান হলো। বৃষ্টির পানিতে বইল রেড রিভার, হাইড্রোইলেকট্রিসিটি সৃষ্টি করলাম আমি। স্টেশনটা বসিয়েছি এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে, নদীর পাড়েই। এখন আর সেকেলে বয়লার হাউসের দরকার নেই আমার। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশও কালো হয় না।'

অভিযাত্রীদের আরও একটা ঘরে নিয়ে গেলেন ক্যামারেট।

'এই যে, এই মেশিনগুলো ডায়নামো, অলটারনেটর, ট্র্যান্সফর্মার আর কয়েল। এই ধরনের মেশিন পরের ঘরটায়ও আছে। এটা হলো আমার থান্ডার সেন্টার। স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ আসে, আর আমি এখানে বসে বজ্র সৃষ্টি করি।'

'ওরে বাপরে!' চোখ কপালে তুলল ফ্লোরেন্স, 'এত মেশিন আনিয়েছেন?'

'সব না। বেশির ভাগই বানিয়ে নিয়েছি।'

'কিন্তু কাঁচামাল তো লাগে। এত দূরে এই মরুভূমিতে আনালেন কি করে অত সব?'

'তাই তো!' চিন্তায় পড়ে গেলেন ক্যামারেট। ব্যাপারটা এর আগে কখনও ভাবেননি, 'অত কিছু তো ভাবিনি! যখন যা দরকার চেয়েছি, এসে গেছে। হ্যারি

কিলারই আনিয়েছে। কিন্তু কি করে আনল…।'

'জিনিসগুলো নিশ্চয় এসেছিল হেলিপ্লেন বানানোর আগে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ফ্লোরেন্স। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ক্যামারেট। আবার বলল সাংবাদিক, 'তাহলেই ভাবুন, মরুভূমি পেরিয়ে অত সব জিনিস আনতে কি সাংঘাতিক পরিশ্রম গেছে। কত লোকের জীবন গেছে, কে জানে!

'হুঁ…।' রক্ত সরে গেছে ক্যামারেটের মুখ থেকে।

'টাকার কথাটাও ভুলবেন না।' ভাবনাটা আরও চাপিয়ে দিল ক্যামারেটের ওপর ফ্লোরেন্স।

'টাকা?'

'টাকা। আপনি সাহেব কোটি কোটি টাকার মালিক?'

'দূর দূর! একটা কানাকড়িও নেই আমার পকেটে।'

'তাহলে অত টাকা কার?'

'আর কার। হ্যারি কিলারের।' মিন মিন করে বললেন ক্যামারেট।

'তাহলেই ভাবুন। অত টাকা কোথায় পেল হ্যারি কিলার? নিশ্চয় কোন কুবেরের বাচ্চা নয় ডাকাতটা।'

'তা তো জানি না!' অসহায়ভাবে বাতাসে হাত নাড়ালেন ক্যামারেট। চোখে ঘোলাটে চাউনি। সত্যিই জানেন না কিছু বিজ্ঞানী।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল ফ্লোরেন্স। কিন্তু সরল লোকটাকে খোঁচানো আর ভাল মনে করলেন না ডক্টর চাতোন্নে। বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে, ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তারচে' যা দেখাতে এসেছেন, দেখান।'

মন থেকে জোর করেই যেন ভাবনাগুলো তাড়ালেন ক্যামারেট। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল মুছে বললেন, 'আসুন।'

পাশের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল সবাই।

'এই আমার কমপ্রেশার্স।' গলায় আবেগ ঢেলে বললেন ক্যামারেট, 'বাতাস আর বিভিন্ন গ্যাসকে তরল করি এখানে। জানেনই তো প্রায় সব গ্যাসকেই তরলিত করা যায়। তাপমাত্রা কমিয়ে চেপে রেখে দিলেই তরল অবস্থায় থাকে। চাপ তুলে নিলেই গরম হয়ে ওঠে আবার। যদি কোন বদ্ধ আধারে রেখে দেয়া হয় তরল গ্যাস, আর সহসা গ্যাসকে আবার তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায়, তো ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আধারটি।

'এই সহসা নিজের আসল অবস্থায় ফিরে যাওয়া রোধ করেছি আমি পুরোপুরি। পুরো অ্যান্টি ডায়াথারমিক, অর্থাৎ যার মধ্যে উত্তাপ একেবারেই ঢুকতে পারে না এমনি পদার্থের আধার তৈরি করেছি। এই আধারে তরল বাতাস বা গ্যাস রেখে দিলে তাপমাত্রা একেবারেই পাল্টায় না। এক থেকে যায়। আধার ফেটে যাবার কোন আশঙ্কাই নেই। এই একটি মাত্র আবিষ্কার চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কারের সহায়ক হয়েছে। দূরপাল্লার হেলিপ্লেন এই আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হয়েছে।'

'ওই হেলিপ্লেন আপনার সৃষ্টি?' নিতান্ত বোকার মতই প্রশ্নটা করল ফ্লোরেন্স।

'তবে কার?' অহংকারে ঘা পড়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন ক্যামারেট। কিন্তু সামলে নিলেন কয়েক সেকেন্ডেই।

'আমার হেলিপ্লেনের তিনটে বৈশিষ্ট্য আছে।' বলে চললেন আবার বিজ্ঞানী, 'বাতাসে স্থির হয়ে ভেসে থাকার ক্ষমতা, জমি থেকে সোজা আকাশে উঠে পড়ার ক্ষমতা আর একনাগাড়ে তিন হাজার মাইল উড়ে চলার ক্ষমতা।

'এখন প্রথমেই দেখা যাক, স্থির থাকার ক্ষমতাটা পাচ্ছে কি করে। হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে অঙ্ক কষতে হয় না পাখিকে, দরকারই হয় না হিসেব করার। আপনা থেকেই ব্যালান্স ফিরিয়ে আনে স্নায়ুমণ্ডলী। এর নাম দিয়েছেন দেহ বিজ্ঞানীরা, রিফ্লেক্স অ্যাকশন। পাখির মতই একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশনের ব্যবস্থা করেছি আমি হেলিপ্লেনে। প্যাসেঞ্জার, পাইলট বসার জায়গা আর মোটর বসানো প্ল্যাটফর্মের ওপরে পনেরো ফুট উঁচু পাইলনের মাথায় দুটো বিশাল ব্লেড নিশ্চয় দেখেছেন? ভারকেন্দ্র রক্ষার জন্যই বসানো হয়েছে ও দুটো।

'ব্লেডের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কিন্তু পাইলন বসানো হয়নি। দিকনির্দেশী বা উচ্চতানির্দেশী হালের সঙ্গে বাঁধা না থাকলে শীর্ষবিন্দুর চারপাশে যেদিকে খুশি অল্প অল্প দুলতে পারে এই পাইলন। ব্লেড জোড়া সামনে বা পেছনে ঝুঁকলে, ঠিকই সামাল দেয় হাল, নিজের ওজনে পাইলনও তৎক্ষণাৎ এর সঙ্গে নতুন অ্যাঙ্গেলে হেলে পড়ে। আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায় হেলিপ্লেনের দুলুনি। ঝাঁকুনির চোটে ডিগবাজি খাবার ভয় নেই আকাশযানের।'

ক্লাসে যেন লেকচার দিচ্ছেন, এমনিভাবে বলে যাচ্ছেন ক্যামারেট। আমতা আমতা করলেন না, শব্দ হাতড়াতে হলো না, যেন সেজে বসে আছে কথাগুলো জিভের ডগায়, এমনি স্বচ্ছন্দে বলে গেলেন। 'দ্বিতীয় পয়েন্টে আসা যাক এবার। টেকঅফ করার সময় ডানা বা ব্লেড দুটো নিচের দিকে নামানো থাকে। লেপটে সিধে হয়ে থাকে পাইলনের গায়ে। আনুভূমিক অবস্থায় ঘুরতে থাকে প্রপেলার। ফলে হেলিকপ্টার পরিণত হয় হেলিপ্লেনে। পুরো যন্ত্রটাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে প্রপেলার। নিরাপদ উচ্চতায় উঠে যাবার পর খুলে যায় ডানা দুটো, এর সঙ্গে তাল রেখে সামনে হেলে পড়ে প্রপেলার। ব্যস, হেলিপ্লেন হয়ে গেল এরোপ্লেন। প্রপেলারের শক্তিতেই দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করে সামনে।

'চালকশক্তির কথায় আসছি এবার। হেলিপ্লেনের ইঞ্জিনের শক্তির প্রধান উৎস তরল বাতাস। অ্যান্টি ডায়াথারমিক পদার্থ দিয়ে তৈরি ফুয়েল ট্যাঙ্কে থাকে এই তরল বাতাস। অনেকগুলো ভালভের মধ্যে দিয়ে উত্তপ্ত একটা সরু নলের মুখে পৌঁছলেই তরল থাকে না আর বাতাস। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ফিরে আসে বায়বীয় অবস্থায়। চলতে শুরু করে মোটর।'

'আপনার হেলিপ্লেনের স্পীড কত?' জানতে চাইল ফ্লোরেন্স।

'আড়াইশো মাইল। ঘণ্টায়। তরল বাতাসে ফুয়েল ট্যাঙ্ক একবার ভরে নিলে একনাগাড়ে উড়ে যেতে পারে তিন হাজার মাইল।'

অসাধারণ প্রতিভাবান এই বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের কথা শুনে বিস্ময়ে থ' মেরে গেল অভিযাত্রীরা। তাদের নিয়ে আবার টাওয়ারে ফিরে এলেন ক্যামারেট।

'হ্যাঁ, ফ্যাক্টরির প্রাণকেন্দ্র এই টাওয়ার,' আবার কথা শুরু করলেন ক্যামারেট, 'এই যে, যে তলায় আছি, এর ওপরে আছে একই রকম আরও পাঁচটা তলা। একই রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো প্রতিটা কক্ষ। টাওয়ারের ওপরে চারদিক ঘিরে বিশাল

উঁচু উঁচু পাইলনগুলো নিশ্চয় দেখেছেন। ওগুলো ওয়েভ প্রজেক্টর। পাইলনের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট কাঁটা আছে। ওগুলোও প্রজেক্টর। কিন্তু ক্ষমতা কম।'

'ওয়েভ প্রজেক্টর?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন ডক্টর চাতোয়ে।

'পদার্থ বিজ্ঞানে আর জ্ঞান দিতে ভাল লাগছে না। হয়তো বিরক্ত হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যেই,' হাসলেন ক্যামারেট। 'কিন্তু তবু ওয়েভ-প্রজেক্টরের মূল তত্ত্বটা একটু বুঝিয়ে দিতে চাই। এই তো, কয়েক বছর আগে হার্জ নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী লক্ষ করেছেন, একটা কনডেনসারের দুটো টার্মিনাল পয়েন্টের মাঝের ছোট ফাঁকে ইনডাকশন কয়েল থেকে একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক চালিয়ে দেয়া গেলে, যন্ত্রটার দুই মেরুর মধ্যে একটা দোলায়মান ক্ষরণ বা তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন ক্যামারেট। 'এখন, এই যে দোলন সৃষ্টি হলো দুটো পয়েন্টের মধ্যে, এখানেই কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকবে না এটা। আশপাশের বাতাসে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ইথারেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইথার বলতে ওজন অনুভব শূন্য, অতি লঘু সেই গ্যাসীয় পদার্থকেই বোঝাচ্ছি আমি, সমস্ত মহাশূন্য থেকে শুরু করে বস্তুদেহের এক কোষ থেকে আরেক কোষের মাঝখানের শূন্যস্থানও যা পূরণ করে রেখেছে।

'ইথারে অনুকম্পন সৃষ্টি করে নিয়মিত মাত্রায় একটু-একটু করে দূরে সরে যায় এই দোলন। এই অনুকম্পন বা ভাইব্রেশনকেই বলে হার্জিয়ান ওয়েভস। বোঝাতে পেরেছি?'

'চমৎকারভাবে,' বললেন পলিটিশিয়ান বারজাক।

কথার জের টেনে নিলেন আবার ক্যামারেট, 'আশ্চর্য এই ওয়েভ এতদিন শুধু বিস্মিতই করেছে ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীদের। একে কাজে লাগানোর কথা কেউ ভাবেনি। আমিই প্রথম ভেবেছি, কাজেও লাগিয়েছি: ওয়েভ বেরোনো পয়েন্ট থেকে দূরে সংস্পর্শশূন্য অবস্থায় বিভিন্ন দূরত্বে রাখা ধাতব দেহে তড়িৎ সঞ্চার করার জন্যে এই ওয়েভকে প্রয়োগ করা হত আগে। কিন্তু একটা অসুবিধে ছিল। পুকুরে ঢিল ফেললে যেমন একই কেন্দ্র থেকে বৃত্তাকারে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ঢেউগুলো, তেমনি পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে যেত ওয়েভগুলো। ফলে শুরুর এনার্জি আর থাকত না দূরে গেলে। কমতে-কমতে একেবারে শেষ হয়ে যেত। মাত্র কয়েক গজের বেশি যেতে পারত না। সহজ করে বলতে পারছি?'

'বলে যান,' বলল ফ্লোরেন্স।

'আয়নায় আলো প্রতিফলিত করার মত এই ওয়েভকেও প্রতিফলিত করা যায়। অনেকেই লক্ষ করেছেন ব্যাপারটা, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। কারণ প্রমাণ করতে পারেননি তাঁরা। আমি কিন্তু পেরেছি। দেখেছেনই তো, ধাতু দিয়ে পাঁচিলের মাথা মুড়ে দিয়েছি? সাধারণ কোন ধাতু নয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি সুপারকনডাকটিভ মেটাল। এই ধাতু দিয়ে এমন রিফ্লেক্টর বানিয়ে নিয়েছি, যে কোন দিকে যে কোন পয়েন্টে ওয়েভসের পুরো শক্তি ধরে রাখতে, পাঠাতে কিংবা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি আমি।

'শূন্যপথে চলার সময় এই শক্তির বিন্দুমাত্র নষ্ট হতে দিই না আমি। ফলে

চলার শুরুতে যা থাকে, শেষেও তাই-ই। দোলনটাকে কত সময়ের ব্যবধানে ব্যবহার করতে হবে, এই পদ্ধতি সবাই জানে। এটা বিবেচনা করে রিসিভার বানিয়ে নেয়ার কথা ভাবলাম। বুঝলাম যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ওয়েভ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে রিসিভার তৈরি করা দরকার। ফ্রিকোয়েন্সির সংখ্যা অসীম, সুতরাং অসংখ্য মোটর বানাতে সক্ষম হব, ধরে নিলাম। হয়েছিও কিন্তু। বুঝতে পারছেন কিছু?'

'শুনতে ভালই লাগছে,' বললেন বারজাক। 'পলিটিক্স হলে আরও কঠিন ব্যাপার হলেও বুঝতাম, কিন্তু বিজ্ঞান তো···।' হাসলেন পলিটিশিয়ান। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন কথার শেষাংশ।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অভয় দিলেন ক্যামারেট, 'আপনাদের মজা লাগলেই হলো। সবার সব জিনিস বুঝতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বিশেষ এই তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছি বলেই অসংখ্য ভারি ভারি চাষের যন্ত্র চালাতে সক্ষম হয়েছি। টাওয়ারের উপরে অত যে কাঁটা রয়েছে, একেকটা একেক মেশিনের শক্তির উৎস। সোজা কথায় কাঁটাগুলো প্রজেক্টর, মেশিনগুলো রিসিভার। বোলতা বাহিনীকেও চালু করি একই পদ্ধতিতে। প্রতিটি বোলতার চারটে প্রপেলারের গোড়ায় রয়েছে ছোট সাইজের চারটে মোটর। প্রতিটি মোটরের সিনটোনাইজেশন আলাদা। তাই টাওয়ারে বসেই যে কোনটাকে কিংবা সবকটাকে একসাথে চালানো যায়। ইচ্ছে করলে এই উপায়ে পুরো ব্ল্যাকল্যান্ড শহরটাকে চোখের পলকে ধ্বংস করে দিতে পারি আমি।'

'বলেন কি, অ্যাঁ!' প্রায় আঁতকে উঠলেন বারজাক, 'পুরো শহরটাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন?'

'অতি সহজে।' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন বিজ্ঞানী। 'একটা অজেয় শহর তৈরি হোক, চেয়েছিল হ্যারি কিলার। বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাইরের কোন শক্তির কাছে অজেয়। আমার কাছে একেবারে ছেলেখেলা এই শহর ধ্বংস করে দেয়া। প্রতিটি বাড়ি, প্রধান রাস্তা আর ফ্যাক্টরির তলায় কায়দা করে রেখে দিয়েছি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বিস্ফোরক। সঙ্গে রয়েছে বিশেষ ওয়েভের সিনটোনাইজেশন। এখানে বসে শুধু ওয়েভগুলো পাঠাব, একটার পর একটা ফাটবে বোমা। ধূলিসাৎ হয়ে যাবে হ্যারি কিলারের অত সাধের ব্ল্যাকল্যান্ড।'

ঝড়ের গতিতে নোট বইয়ে ক্যামারেটের বক্তব্য লিখে যাচ্ছে ফ্লোরেন্স। একবার ইচ্ছে হলো বলে, দিন না এখুনি নষ্ট করে। কিন্তু কি ভেবে আবার চুপ করে রইল।

'টাওয়ারের মাথার বড় পাইলনটার কাজ কি, বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর চাতোন্নে।

'হার্জিয়ান ওয়েভসের একটা অদ্ভুত ধর্ম লক্ষ করা গেছে, জানেন না নিশ্চয়। মাধ্যাকর্ষণের টানে আস্তে আস্তে নিচে নেমে যায় ওয়েভ। কাজেই বেশি দূরে ওয়েভ পাঠাতে হলে উঁচু জায়গা থেকে পাঠাতে হয়। কিন্তু কত উপর থেকে আর পাঠাবেন বলুন? আর কত উপরেই বা পাঠাতে পারবেন? তাই অন্য একটা কাজ করেছি আমি। উঁচু পাইলনের মাথায় আমার নিজের তৈরি রিফ্লেক্টর বসিয়েছি।'

'বেশি উপরে ওয়েভ পাঠাতে চান কেন?' লিখতে লিখতেই জিজ্ঞেস করল ফ্লোরেন্স।

'বৃষ্টি ঝরানোর জন্যে। হ্যারি কিলারের সঙ্গে দেখা হবার সময় এই তত্ত্বটাই মাথায় ঘুরছিল আমার। শুনে সেও লাফিয়ে উঠল। পাইলন আর রিফ্লেক্টরের দৌলতে মেঘ লক্ষ্য করে ওয়েভ পাঠাই আমি। তড়িৎ প্রবাহ দিয়ে মেঘের পানিকে সম্পৃক্তির পয়েন্টে নিয়ে যাই। স্যাচিউরেশন পয়েন্ট। অল্প সময়ের মধ্যেই পাশাপাশি দুটো মেঘ কিংবা মেঘ আর মাটির মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টি। মরুভূমি শ্যামলিমায় ছেয়ে দিতে কতক্ষণ?' সবার দিকেই গর্বিতভাবে চাইলেন ক্যামারেট।

'কিন্তু মরুভূমির আকাশে মেঘ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর চাতোন্নে।

'ঠিকই বলেছেন। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধেই হত। সারাক্ষণ হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম কখন মেঘ উড়ে যায়। এখন আর তার দরকার নেই। নিচে শ্যামলিমা। সারাক্ষণই মেঘ থাকে উপরের আকাশে।'

'দারুণ আপনার প্রতিভা!' আন্তরিক প্রশংসা করলেন ডাক্তার।

এক একটা আবিষ্কারের কথা শোনাচ্ছেন, আর একটু একটু করে উত্তেজিত হচ্ছেন মারসেল ক্যামারেট। ডাক্তারের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আরও, 'আপনারা টের পাচ্ছেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিকই দিকে দিকে ওয়েভ ছুটে যাচ্ছে পাইলনের চুড়ো থেকে। এই আবিষ্কারের ফলে আরও কত কি যে করা যায় কল্পনা করতে পারবেন না। যেমন, পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় বেতার টেলিফোনের ব্যবস্থা করা যায়।'

'বেতার টেলিফোন!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বারজাক।

'বেতার টেলিফোন। শুধু একটা বিশেষ রিসিভার দরকার। গবেষণা করছি এ-নিয়ে। প্রায় সফল হয়ে এসেছে পরীক্ষা।'

'বাড়াবাড়ি…।' অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললেন বারজাক।

'মোটেই না।' উত্তেজনা বাড়ছে ক্যামারেটের, 'মামুলী টেলিগ্রাফ যন্ত্রে বিশেষ সার্কিট লাগিয়ে নিয়েছি। গোটা কয়েক সুইচ টিপলেই ওয়েভ সৃষ্টিকারী কারেন্ট ঢুকবে সার্কিটে। তারের পথ বেয়ে পৌঁছে যাবে পাইলনের চূড়ায়। ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে।'

থেমে সবার মুখের দিকে চাইলেন একবার মারসেল ক্যামারেট। তারপর আবার বলে চললেন, 'ওয়েভ প্রজেক্টরের মুখ কিন্তু আকাশের দিকে ফেরানো নেই এখন। তবে রিফ্লেক্টরের মুখ ফিরিয়ে দিলেই ওয়েভগুলো গিয়ে সংহত হবে বিশেষ রিসিভারে, অর্থাৎ যে রিসিভারের উদ্দেশে সংবাদ পাঠানো হবে আর কি!'

'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়,' বললেন বারজাক।

'কেউ যদি রিসিভার নিয়ে বসে থাকত এখন, আপনাকে হাতে কলমে ব্যাপারটা দেখাতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অমন রিসিভার নেই কারও কাছে। আসলে বানাতেই পারেনি। কিন্তু তবু চাবিগুলো টিপেটুপে দেখাই আপনাদের।' বলেই একটা ছোট টেবিলে বসানো কতগুলো সুইচের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্যামারেট। সুইচবোর্ডে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে খবর

পাঠাবেন?'

'আপনি তো বললেন, আর কারও কাছে অমন কোন রিসিভার নেই। কিন্তু যদি বাইরের দুনিয়ায় থাকত, তো এ মুহূর্তে ক্যাপ্টেন মারসিনেকেই খবর পাঠাতে বলতাম আমি,' বললেন বারজাক।

'ধরুন অমন একটা রিসিভার আছে ক্যাপ্টেনের কাছে,' বলেই খটাখট কতগুলো সুইচ টিপলেন ক্যামারেট। ফিরে জানতে চাইলেন, 'কোথায় আছেন তিনি এখন?'

'সম্ভবত টিম্বাকটুতে,' এটুকু বলতেই লাল হয়ে গেল জেনের গাল।

'হুঁহ্। টিম্বাকটু।' আরও গোটা দুই সুইচ টিপলেন ক্যামারেট, 'তা কি বলতে চান ক্যাপ্টেন মারসিনেকে?'

'বলুন আমি তাঁর সাহায্য চাই।'

'চাইতে পারেন, কিন্তু কাজ হবে না। কারণ এখবর তো আর তাঁর কাছে পৌঁছুচ্ছে না। কিন্তু তবু শুধু আপনাদের দেখানোর জন্যেই পাঠাচ্ছি "ব্ল্যাকল্যান্ডে বন্দিনী মিস জেন ব্লেজন। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে ক্যাপ্টেন মারসিনেকে।" আরে আসল কথাই তো বলিনি। ব্ল্যাকল্যান্ড কোথায়, তাই তো জানে না বাইরের দুনিয়া। "ব্ল্যাকল্যান্ডের অবস্থান, অক্ষাংশ পনেরো ডিগ্রী পঞ্চাশ মিনিট উত্তরে। দ্রাঘিমা...।' তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যামারেট, 'আরে কারেন্ট চলে গেল যে! বুঝেছি, হ্যারি কিলারের কাজ।'

সবাই ভিড় করে এল ক্যামারেটের চারপাশে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল।

'আপনাদের বলেছিলাম না,' একটুও হতাশ মনে হলো না ক্যামারেটকে, 'ছ' মাইল দূরের হাইড্রোলিক ইলেকট্রিসিটি সেন্টার? নাকি বলিনি? না বললেও কিছু আসে যায় না। হ্যাঁ, সেখান থেকেই আসে কারেন্ট। এবং এইমাত্র ফ্যাক্টরির ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দিল হ্যারি কিলার।'

'সর্বনাশ! যন্ত্রপাতি তো কিছুই কাজ করবে না তাহলে। থেমে যাবে!' ডক্টর চাতোন্নের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'যাবে কি, গেছেই ইতিমধ্যে।'

'বোলতা বাহিনী?'

'অকর্মণ্য।'

'তাহলে এবারে আমাদের বারোটা বাজাবে হ্যারি কিলার।'

'না, তা পারবে না।' জোর গলায় বললেন ক্যামারেট। 'কারেন্ট বন্ধ করেও আমাদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত দিতে পারবে না কিলার। আসুন আমার সঙ্গে। দেখে যান, এখনও আগের মতই দুর্লভ হয়ে আছি আমরা, হ্যারি কিলারের কাছে।'

ওপরতলায় চললেন ক্যামারেট। তাঁর পিছু পিছু এসে পৌঁছুল অভিযাত্রীরা। সাইক্লোস্কোপের দিকে তাকাল। পাঁচিলের বাইরেটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। এমন কি পরিখাটা পর্যন্ত। নিথর হয়ে পরিখার পানিতে ভাসছে কয়েকটা বোলতা। কারেন্ট বন্ধ হবার আগের মুহূর্তেও পরিখার ওপরের আকাশে ঘোরাফেরা করছিল ওগুলো।

এসপ্ল্যানেডে হৈ হৈ করে লাফাচ্ছে মেরি ফেলোরা। আনন্দে নাচতে নাচতে

ছুটে আসছে কয়েকজন নতুন উদ্যমে, ফ্যাক্টরি আক্রমণ করবে। ঝপাঝপ পরিখার পানিতে লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখের ভাব বদলে গেল ওদের। আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। ব্যাপার কি?

দেখতে দেখতে পরিখার মধ্যেই ঢলে পড়ে গেল ওরা।

হা হা করে হাসলেন ক্যামারেট, 'নিশ্চয় ভাবছেন, আমি নিষ্ঠুর? কিন্তু এর দরকার ছিল। কারেন্ট বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেছে তরল কার্বনডাই অক্সাইডের আধারের মুখ। ব্যবস্থাটা অটোমেটিক। ফ্যাক্টরিটা তৈরির পর পরই এটাকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। যদিও ভেবেছিলাম, এর প্রয়োজন কোন দিনই পড়বে না।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। গ্যাসে ভরে উঠেছে এখন পরিখা। বাতাসের চেয়ে ভারি কার্বনডাই-অক্সাইড পরিখায়ই থাকবে আপাতত। যে-ই পেরোতে চেষ্টা করবে দম বন্ধ হয়ে মরবে।'

'উফ্!' মেরি ফেলোদের ছটফটিয়ে ঢলে পড়ার দৃশ্য আর সইতে পারল না জেন। মুখ ফেরাল সেদিক থেকে।

'ওদেরই দোষ।' নিজের স্বপক্ষে বললেন ক্যামারেট, 'আমি তো আর ওদের আক্রমণ করিনি।'

'আরে একি!' হঠাৎ অবাক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফ্লোরেন্স।

অভিযাত্রীরা সবাই অবাক হলো! দ্রুত পানি থেকে উঠে পড়ছে বোলতাগুলো। আবার কারেন্ট চালু করে দিল নাকি হ্যারি কিলার?

উত্তরটা দিলেন ক্যামারেট, 'না, হ্যারি কিলার চালু করেনি। বিপদের সময়ে কারেন্টের বদলে তরল বাতাস দিয়ে যন্ত্রপাতি চালানোর ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। সুতরাং, আবার আগের মতই কাজ করতে শুরু করেছে যন্ত্রপাতিগুলো। কিন্তু বেশিক্ষণ চলবে না। বাতাস ফুরিয়ে গেলেই থেমে যাবে। কারেন্ট ছাড়া নতুন করে তরল বাতাসও তৈরি করা যাবে না আর।'

পাঁচিল ঘেঁষে আবার উড়তে শুরু করেছে বোলতাগুলো। হাঁ করে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল পরিখার ওপারে দাঁড়ানো জ্যান্ত মেরি ফেলোরা। তারপর মৃত সঙ্গীদের লাশগুলো পানিতে ফেলে রেখেই যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

ঘর কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়ালেন মারসেল ক্যামারেট। চোখের তারা আবার ঘোলাটে হয়ে উঠেছে তাঁর। 'লাগতে আসবি আর মারসেল ক্যামারেটের সঙ্গে?' অহংকারে ফেটে পড়ছেন বিজ্ঞানী।

আট

বারজাক মিশন ছেড়ে আসার পর থেকেই মন ভাল নেই ক্যাপ্টেন মারসিনের। জেনের চিন্তা করে প্রায় সারাক্ষণই। কিন্তু মনে-প্রাণে সৈনিক সে। কাউকে বুঝতে দিল না, মনের ভেতরে তার কি চলছে।

একটানা ন'দিন চলে সিগৌসিকোরা পৌচেছে বাইশে ফেব্রুয়ারি রাতে। পরের দিনই কর্নেল সেন্ট অবানের আদেশপত্র দেখাল এখানকার সেনাধিপতি কর্নেল সারজাইপকে।

মনোযোগ দিয়ে তিনবার আদেশপত্রটা পড়লেন কর্নেল। অবাক হলেন। কিছুই বোধগম্য হলো না তাঁর। 'আশ্চর্য তো। টিম্বাকটুতে পাঠানোর জন্যে বারজাক মিশন থেকে সৈন্য তলব করেছে!'

'আমার আসার কথা তাহলে জানা নেই আপনার?' অবাক হল মারসিনেও।

'বিন্দুমাত্র না।'

'লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের মুখে শুনলাম, টিম্বাকটুতে গোলমাল শুরু হয়েছে।'

'তাই নাকি? কই, শুনিনি তো! লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের নামও শুনিনি। গতকাল এখান দিয়েই গেছে পিরোলিজ। টিম্বাকটু হয়ে ডাকার যাবে। সেও তো কিছু বলল না।'

'অথচ দেখতেই পাচ্ছেন, আমাকে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে।'

'হুকুম যখন হয়েছে, যেতেই হবে। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না আমি।'

সিগৌসিকোরা থেকে রওনা দিতে দেরি হয়ে গেল ক্যাপ্টেন মারসিনের। পথশ্রমে ক্লান্ত সিপাইরা। তার ওপর রসদপত্র ঠিকঠাক করে জোগাড়ের ব্যাপার আছে। সময় কিছু লাগবেই।

২ মার্চ দলবল নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন মারসিনে।

টিম্বাকটুর বন্দর কাবারাতে পৌঁছুল ১৭ মার্চ। কর্নেল অবানের আদেশপত্র দেখাল কর্নেল আলিগ্রেকে। সারজাইপের মতই হাঁ করে থাকলেন কর্নেল আদেশপত্র দেখে। আকাশ থেকে পড়লেন যেন। টিম্বাকটুতে তো গোলমালের নামগন্ধও নেই। তাহলে অমন সৃষ্টিছাড়া আদেশ দিতে গেলেন কেন অবান?

এবারে সত্যিই খটকা লাগল মারসিনের। জাল সই নয় তো? কিন্তু কেন? উদ্দেশ্য? একটাই উত্তর আছে। বারজাক মিশন ভণ্ডুল করে দেয়া। কিন্তু তাই বা কেন? জেনের জন্যে উদ্বেগে ভরে উঠল ক্যাপ্টেনের মন। উদ্বেগটা পরিণত হলো ভয়ে, আশঙ্কায়, যখন শুনল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের নাম কেউই শোনেনি।

কর্নেল অবানের সই পরীক্ষা করে দেখা হলো। কিন্তু জাল বলে প্রমাণ করা গেল না। বোঝা যাচ্ছে, কর্নেল অবানের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

দশ মাইল সাংঘাতিক জঙ্গল ঠেঙিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে মারসিনে, এমন সময় হঠাৎ করেই তার এক পুরানো বন্ধু এসে হাজির টিম্বাকটুতে। সেনাবাহিনীতেই আছে, ক্যাপ্টেন। এঞ্জিনীয়ার। বিজ্ঞান পাগল। ছোটখাট অনেক আবিষ্কার আছে তার। এই তো মাত্র দু'মাস আগে একটা রেডিও রিসিভার আবিষ্কার করেছে।

খবর পেয়ে গিয়ে হাজির হলো মারসিনে। কর্নেল অবানের ওখানে চলে যাবে, তাই পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখাটা করেই যাবার ইচ্ছে। সেই আগের মতই আছে পেরিগানি। সঙ্গে নতুন আবিষ্কৃত রেডিও রিসিভারটাও আছে।

আদর অভ্যর্থনা শেষ হবার পর প্রথমেই মারসিনেকে রিসিভারটা দেখাল পেরিগানি। দুটো ইলেকট্রিক ব্যাটারি, কিছু ইলেকট্রিক ম্যাগনেট, ধাতুর কুঁচো ভর্তি

একটা ছোট কাঁচের নলকে ঘিরে কয়েক গজ খাড়াই একটা তামার দণ্ড, এই নিয়ে রিসিভার।

কিন্তু যন্ত্রটা দেখে মুচকে হাসল মারসিনে, বলল, 'এটা আবার কিরে বাবা! বই পড়ে পড়ে এবারে সত্যি সত্যিই তোর মাথাটা গেছে দেখছি।'

'ন্যাহে, খুনে নেকড়ে, তা না। ডাকিনী বিদ্যের প্র্যাকটিকাল সংস্করণ এটা। বেতার টেলিগ্রাফী বলতে পারিস এটাকে।'

'এ ধরনের যন্ত্রের কথা আজকাল প্রায়ই শুনছি। কিন্তু কাজ কিছু হয়?' খুব একটা আগ্রহ দেখাল না মারসিনে।

'হবে না কেন? নিশ্চয় হয়। থাকিস তো জঙ্গলে জঙ্গলে, আর মানুষ খুন করে বেড়াস। পৃথিবীর কোথায় কি উন্নতি হলো জানিস কিছু?' একটু থেমে বন্ধুকে বোঝানোর জন্যে বলল, 'এই সঙ্গে দুটো আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসে আছেন দু'জন বিজ্ঞানী। একজন ইটালির মানুষ, মার্কনি। শূন্যে হার্জিয়ান ওয়েভ পাঠানোর পদ্ধতি বের করে ফেলেছেন তিনি। অন্যজন ফ্রান্সের লোক। নাম ডক্টর ব্রানলি। সেই ওয়েভকে পাকড়াও করার রিসিভার তৈরি করে ফেলেছেন। সেটার উন্নতি করে করে বেশ চমৎকার একটা জিনিস বানিয়েছি আমি।'

'এই হ-য-ব-র-লটা!' মারসিনের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

ব্যঙ্গটা গায়ে মাখল না পেরিগনি। বলেই চলল, 'ব্রানলি দেখেছেন, লোহার কুঁচোর তড়িৎ পরিবাহিতা খুবই কম, কিন্তু হার্জিয়ান ওয়েভসের সংস্পর্শে এলেই উৎকৃষ্ট পরিবাহী হয়ে দাঁড়ায়। তখন কুঁচোগুলো নিজেরাই নিজেদের টানাটানি করে সম্পৃক্তি-প্রবণ হয়ে যায়। গায়ে গায়ে আটকে এক হয়ে যায় নতুন শক্তির জোরে।' যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল, 'ছোট্ট এই নলটা দেখছিস তো? এর মধ্যেই চলে সম্পৃক্তি প্রবণতার খেলা। সোজা কথায় এই টিউব হয়ে দাঁড়ায় একটা ভালব টিউব, কিংবা বলতে পারিস ওয়েভ ডিটেক্টর। ওয়েভের সংস্পর্শে এলেই লোহার কুঁচোগুলো গায়ে লেগে যায়। মোটা মাথায় ঢুকছে তো?'

'বলে যা।' কৌতূহলী হয়ে উঠছে মারসিনে আস্তে আস্তে।

'ব্যাটারি সার্কিটে লাগানো রয়েছে টিউবটা। কিন্তু কারেন্ট চলছে না ভেতর দিয়ে। বুঝতে পারছিস তো কেন?'

'ওয়েভের সংস্পর্শে আসেনি।'

'বা-বা! খুলির ভেতরের হলুদ পদার্থগুলো খোলাসা হতে আরম্ভ করেছে দেখছি। হ্যাঁ, এই যে তামার অ্যানটেনা দেখছিস, এর সঙ্গে টিউবের যোগ রাখা হয়েছে। কেন জানিস? শূন্য পথে ওয়েভস এসে তামার দণ্ড বেয়ে টিউবে ঢুকবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে যাবে টিউবের ভেতরের লোহার কুঁচো। ব্যাটারি থেকে কারেন্ট এসে বইতে শুরু করবে পুরো সার্কিটে।'

'ভারি মজা তো!'

'আরে শালা, বিজ্ঞানের আশ্চর্য ব্যাপার স্যাপারে তুইও মজা পাস!'

'একবার কায়দা মত পড়লে মানুষ খুন করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবি তুইও। কারণ এছাড়া নিজেকে বাঁচাবার আর কোন পথই খোলা থাকবে না তখন তোর জন্যে। তা হ্যাঁ, বলে যা। শুনতে সত্যিই ভাল লাগছে।'

'সার্কিটে কারেন্ট বইতে শুরু করলেই একটা মোর্স রিসিভার চালু হয়ে যায়। ছাপা হয়ে একটা কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসে। একই সঙ্গে ছোট্ট একটা হাতুড়ি পেটায় ওয়েভ-ডিটেক্টর এই টিউবটাকে। ঠোক্কর খেলেই ঝাঁকুনির চোটে লোহার কুঁচোগুলো ছড়িয়ে পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় তড়িৎ-প্রবাহ। কাগজের ফিতের ছাপাও বন্ধ হয়ে যায়।

'হয়তো বলবি এবারে, তাহলে কাগজে তো মাত্র একটা অক্ষরই ছাপা হলো। তা কিন্তু নয়। হার্জিয়ান ওয়েভ আসতে থাকলে ছড়িয়ে যাবার পর পরই আবার এক হয়ে যাবে কুঁচোগুলো। আবার চালু হয়ে যাবে সার্কিট। আবার অক্ষর ছাপা হবে। লোহার হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে আবার ছড়িয়ে যাবে কুঁচো। এমনি চলতেই থাকবে। ওয়েভ আসা বন্ধ হলেই থেমে যাবে স্বয়ংক্রিয় ভাবে। আবার এলেই আবার চালু হয়ে যাবে। ব্যাটারি কানেকশন কেটে না দেয়া পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে।'

'যদি সত্যিই কাজ করে, মজার যন্ত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?'

'আরে, অমন একটা যন্ত্র বয়ে বেড়াব না? ঠিক এই মুহূর্তেই যে কোন বিজ্ঞানী প্রেরক যন্ত্র তৈরি করে নিজেরই বানানো রিসিভারে ধরার পরীক্ষা চালাচ্ছেন না, কে বলল? সারা পৃথিবীতেই তো এখন এই যন্ত্র নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন বিজ্ঞানীরা। কে জানে, কখন যন্ত্র খুলেই শুনতে পাব, ডাক পাঠাচ্ছেন কোন্ বিজ্ঞানী।'

'হুঁ! তোর মত গাধা তো ডজন ডজন মেলে কিনা, পাগলামি করতে যাবে।'

'যাবে, যাবে। আর এটাকে পাগলামি বলছিস কেন? জানিস, যদি ব্যাপারটায় পুরোপুরি সাক্সেসফুল হওয়া যায়, কি অসামান্য এক কাণ্ড ঘটবে? মানুষের উন্নতি কোথায় গিয়ে উঠবে এক লাফে?'

'কিন্তু যদি সাক্সেসফুল হওয়া যায়, তবে তো?' একটু কি যেন ভাবল মারসিনে, 'এক কাজ কর না। মেশিনটা একটু চালিয়ে দেখ না।'

ব্যাটারি সংযোগ করে দিল পেরিগনি। সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ আওয়াজ উঠল।

'চালু হয়ে গেল যন্ত্র। যদি কেউ ওয়েভ পাঠায়...।' আচমকা থেমে গেল পেরিগনি। চোখ বড় বড় করে তাকাল রিসিভারটার দিকে। বিচিত্র একটা খড় খড় আওয়াজ বেরোচ্ছে যন্ত্রটা থেকে। 'একি! স্বপ্ন দেখছি না তো! এযে সত্যিই ওয়েভ পাঠাচ্ছে কেউ!'

'অ্যাঁ।'

'শুনতে পাচ্ছিস না, খড় খড় করছে যন্ত্রটা?'

'তোর যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে। আফ্রিকায়, এই অঞ্চলে অমন যন্ত্র আর কারও কাছে থাকতে পারে না। ইউরোপ হলে কথা ছিল।'

'চুপ!'

রিসিভারটার ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়ল পেরিগনি। কান ঠেকাল যন্ত্রটার গায়ে। দুই সেকেন্ড ভেতরের আওয়াজ মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসা কাগজের ফিতেটার দিকে চাইল। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে টান মেরে ছিঁড়ে নিল লেখা অংশটুকু। মোর্সের অনুবাদ জোরে জোরে পড়ল, 'ক্যাপ...টেন...

মার…সিনে!'

'আরে! তোর নামই যে!'

'ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পাসনি, শালা। এটা কোন এক ধরনের ছাপার যন্ত্র বানিয়েছিস। আর বলছিস রেডিও রিসিভার। গাধা পেয়েছিস আমাকে?' প্রায় খেপেই উঠল মারসিনে।

'চুপ!' ধমক লাগাল পেরিগনি। আবার ঝুঁকে পড়ল যন্ত্রের উপর।

আর টিটকিরি মারতে পারল না মারসিনে। বুঝল, ধোঁকা দিচ্ছে না পেরিগনি।

আবার ছাপা কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসতেই প্রায় ছোঁ মেরে ছিঁড়ে তুলে নিল পেরিগনি। এক নজর চোখ বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'মারসি…মারসি…এবারে তোর ঠিকানা বলছে। টিম্বাকটু!'

'টিম্বাকটু!' অবাক হলো মারসিনেও। কে খবর পাঠাচ্ছে তাকে? পনেরো সেকেন্ড থেমে ছিল, আবার চালু হলো রিসিভার। ছাপা ফিতে বেরিয়ে আসতেই পড়ল পেরিগনি, 'আমি মার্সেল ক্যামারেট।'

চমকে উঠল মারসিনে। তারপরই হাঁফ ছাড়ল। বলল। 'ওই নামে কাউকে চিনি না। পেরি, আমাদের নিয়ে মজা করছে কেউ।'

'কিন্তু তা কেন করতে যাবে? কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হলো, তার কাছেও একটা অতি উন্নতমানের প্রেরক যন্ত্র আছে। আরে…আবার শুরু করেছে।'

ছাপা হয়ে যথারীতি বেরিয়ে এল কাগজ। এবারে অনেকখানি বেরোল।

জোরে জোরেই পড়ল পেরিগনি, 'ব্ল্যাক…ল্যান্ডে… বন্দিনী…মিস… ব্লেজন… তাঁকে…উদ্ধার…করে…নিয়ে যাবার…অনুরোধ…জানানো…হচ্ছে…ক্যাপ্টেন… মারসিনেকে।'

'জেন ব্লেজন!' আঁতকে উঠল মারসিনে। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল কোমরের খাপে রাখা পিস্তলের ওপর।

একটু থেমেছে মেশিন। মারসিনের আকস্মিক পরিবর্তনে অবাক হলো পেরিগনি। বন্ধুর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মারসি, অমন করছিস কেন?'

'সে অনেক কথা।' বলে আপনমনেই বলল, 'কিন্তু ব্ল্যাকল্যান্ড জায়গাটা কোথায়?'

হঠাৎই আবার চালু হয়ে গেল যন্ত্র। তাড়াতাড়ি আবার রিসিভারের ওপর ঝুঁকে পড়ল পেরিগনি।

চলতে চলতে যেন মাঝপথে থেমে গেল যন্ত্র। কাগজের ফিতে ছিঁড়ে নিল পেরিগনি। পড়ল, 'অক্ষাং…পনেরো… ডিগ্রী…পঞ্চাশ…মিনিট…দ্রাঘিমা…!' কাগজটা হাতে রেখেই মারসিনের মুখের দিকে চাইল, 'পুরো শেষ হয়নি সংবাদ। যে কোন কারণে থেমে গেছে মাঝপথে।'

আবার মেশিন চালু হওয়ার অপেক্ষায় রইল দু'বন্ধু। কিন্তু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পরও আর কোন খবর এল না। ব্যাটারি কানেকশন না কেটেই কথা বলল পেরিগনি, 'আফ্রিকার এই দুর্গম অঞ্চলে আমারটার চাইতেও উন্নত এক রেডিও

টেলিগ্রাফ নিয়ে কেউ বসে আছে।' বন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু জেন ব্লেজন কে? ভালমতই চিনিস তাকে মনে হচ্ছে?'

সংক্ষেপে বারজাক মিশনের কথা শোনাল পেরিগনিকে মারসিনে। পরিষ্কার বুঝল, যে করেই হোক, কর্নেল অবানের সই জাল করে তাকে বারজাক মিশন থেকে বের করে নিয়ে এসেছে ল্যাকোর নামধারী লোকটা। তারপর বারজাক মিশনের লোকজনকে হয় হত্যা করে কিংবা জেনের সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে গেছে। কিন্তু কারা?

যে করেই হোক জেনকে উদ্ধার করতে যাবেই মারসিনে, বদ্ধপরিকর সে। পেরিগনিও সায় দিয়ে বলল, 'আমিও যাব। তোর ভাবী বউকে উদ্ধার করতেই হবে, যে করেই হোক।'

'কিন্তু কোথায় যাব ভালমত জানিই না যে। অবস্থানটা পরিষ্কার করে জানাতে পারলেন না তো সংবাদ প্রেরক।'

'সে যে করেই হোক খুঁজে বের করব। আগে কর্নেল অবানের কাছে চল। তাকে জানাতে হবে আগে সব। তারপর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

সেই দিনই কর্নেল অবানের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল দুই বন্ধু।

সব শুনলেন কর্নেল অবান। জাল করা নিজের সই দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জাল যে করেছে তার প্রশংসা না করে পারলেন না। চিঠিও পড়লেন। তারপর মোর্স কোড ছাপা ফিতেগুলো পড়ে বললেন, 'কিন্তু এতে তো মঁসিয়ে বারজাকের কথা কিছু লেখা নেই।'

'কিন্তু মিস ব্লেজন ওঁর সঙ্গেই ছিলেন,' বলল পেরিগনি। 'পরে দলছাড়া হতে পারেন। বারজাক মিশনের গন্তব্যস্থান জানা আছে আমার। অত উঁচু ল্যাটিচিউডে নয়।'

'একেবারে ভুল বলেননি আপনি, স্যার।' বলল মারসিনে, 'উত্তরে একলা যাবেন, বলেছিলেন মিস ব্লেজন।'

'তাই-ই হবে।' মাথা নেড়ে বললেন কর্নেল, 'বারজাক মিশন সরকারী অভিযান। তাঁরা বিপদে পড়লে সৈন্য পাঠানো যায়। কিন্তু বেসরকারী কারও জন্যে...।'

'মিথ্যে আদেশপত্র দেখিয়ে আমাকে সরিয়েছে শয়তানেরা। বারজাক মিশন নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে কিনা কে জানে। তাদের শাস্তি দেবার জন্যেও অন্তত যাওয়া দরকার আমার।' জোর দিয়ে বলল মারসিনে।

'বারজাক মিশনের ক্ষতি হয়েছে জানলে নিশ্চয় সেনাবাহিনী পাঠাব আমি। কিন্তু শুধু মিস ব্লেজনের জন্যে...।'

'যাবার আদেশ নেবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম কর্নেল অবান, স্যার।'

'কিন্তু আমি নিরুপায়, ক্যাপ্টেন। তাছাড়া ব্ল্যাকল্যান্ড জায়গাটা কোথায়? যে ল্যাটিচিউডের কথা বলা হয়েছে ওটা তো সাহারার একেবারে ভেতরে। ওই ধু ধু মরুভূমিতে একটা শহর বা জনবসতি থাকে কি করে? সৈন্য পাঠানোর ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হবে অমন জায়গায়? আরও একটা ব্যাপার আছে। ব্ল্যাকল্যান্ড শব্দটা

ইংরেজি। যে ঠিকানা পাওয়া গেছে, তার খুব কাছাকাছিই ব্রিটিশ কলোনি "সোকারটা"। শেষকালে না ইংরেজ বসতি আক্রমণের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি। সবচে' বড় কথা কিছুদিন ধরেই একটা অদ্ভুত খবর কানে আসছে। মরুভূমির মাঝে কোথায় নাকি একটা আশ্চর্য রাজ্য গড়ে উঠেছে। ওটার নাগরিকরা নাকি সব চোর-ছ্যাচোড়-দাগী আসামী। কে জানে, ওটাই ব্ল্যাকল্যান্ড কিনা? ল্যাটিচিউড দেখে কিন্তু এই সন্দেহই হচ্ছে আমার। নাহ্ ক্যাপ্টেন, তোমাকে সৈন্য দেয়া কিছুতেই আমার উচিত হবে না।'

'ঠিক আছে, আপনার এখান থেকে নাই-ই দিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে যারা এসেছে, তাদের তো নিতে পারি?'

'না। কারণ তারাও সরকারী সৈন্য। তাছাড়া এখনই অত অধীর হচ্ছ কেন? একবার যখন পাঠিয়েছেন আবার খবর পাঠাতে পারেন মিস ব্রেজন।'

'কিন্তু একটা অনিশ্চিত অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'আমি নিরুপায়, ক্যাপ্টেন।'

'বেতারবার্তার মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বিপদ সঙ্কেতই ধরে নেয়া যেতে পারে।'

'তবু আমি নিরুপায়!'

'আমি তাহলে একাই যাব, কর্নেল।'

'একা?'

'আমাকে ছুটি দিন।'

'না। এরকম ঝুঁকির মধ্যে আমার একজন দায়িত্ববান অফিসারকে যেতে দিতে পারি না।'

'বেশ, তাহলে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত মারসিনের দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল। তারপর নরম সুরে বললেন, 'কিন্তু তোমার পদত্যাগপত্র নেয়ার অধিকার আমার নেই, জানো নিশ্চয়। আমি শুধু রেকমেন্ড করে হাই লেভেলে পাঠাতে পারি। ঠিক আছে, আমাকে আর একটু ভাববার সময় দাও। কাল সকালে কথা হবে।'

স্যালুট করে বেরিয়ে এল দুই ক্যাপ্টেন। বন্ধুকে নানা রকমে আশ্বাস দিয়ে নিজের ব্যারাকে ফিরে গেল পেরিগনি। চিন্তিতভাবে নিজের সৈন্যদের কাছে ফিরল মারসিনে।

নয়

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে নিজেই বিপদে পড়ল হ্যারি কিলার। বন্ধ হয়ে গেল চাষের মেশিন, পাইলনের চুড়ো থেকে আর ছুটছে না ওয়েভ। বন্ধ হয়ে গেল পানির পাম্প। দুটো পাম্পের একটা ফ্যাক্টরির ভেতরে। পাম্প বন্ধ হতেই দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল রিজারভয়ের। কিন্তু নদী থেকে পানি এসে খালি জায়গা পূরণ

হচ্ছে না। রাতের বেলা অন্ধকার হয়ে রইল ব্ল্যাকল্যান্ড।

বাধ্য হয়ে ১০ এপ্রিল ফের কারেন্ট চালু করে দিল হ্যারি কিলার। ফোন করল মারসেল ক্যামারেটকে। অনেক বলে কয়ে একটা রফা করে নিল। বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখবে হ্যারি কিলার, বিনিময়ে শহরের সমস্ত কলকজা চালু রাখার ভার ক্যামারেটের।

দুপুর নাগাদ আরও কিছু চাইল হ্যারি কিলার। অবশ্যই অতি বিনয়ের সঙ্গে। বন্দীদের ফেরত চাইল সে। সোজা না করে দিলেন ক্যামারেট। চল্লিশটা হেলিপ্লেনের জন্যে তরল বাতাস চাইল কিলার। ফুরিয়ে গেছে নাকি। আবার না করলেন ক্যামারেট। নিজেরই দরকার এখন তাঁর তরল বাতাস। তাছাড়া বাতাস দিয়ে বিপদে পড়বেন নাকি? উড়ে এসে ফ্যাক্টরির ওপর বোমা ছুঁড়তে শুরু করবে কিলারের লোকেরা। ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে বন্দীদের।

ক্যামারেটের 'না না' শুনে আর রাগ দমিয়ে রাখতে পারল না হ্যারি কিলার। খেপে গিয়ে টেলিফোনেই চেঁচাতে লাগল, তার কথা না শুনলে ফ্যাক্টরিসুদ্ধ লোককে উপোস করিয়ে রাখবে। প্রাণখোলা হাসি হেসে লাইন কেটে দিলেন ক্যামারেট।

তাঁর সঙ্গে কিন্তু হাসিতে যোগ দিতে পারল না বন্দীরা। বাইরে থেকে হ্যারি কিলার ফ্যাক্টরি অবরোধ করিয়ে রাখলে একদিন তো জমানো খাবার শেষ হয়েই যাবে। তখন? বোলতা বাহিনী হয়তো ফ্যাক্টরির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না মেরি ফেলোদের, কিন্তু খাবার তো জোগাড় করতে পারবে না।

ক্যামারেটকে জিজ্ঞেস করলেন বারজাক, 'কতদিনের খাবার মজুত আছে ফ্যাক্টরির গুদামে?'

'ঠিক জানি না,' জবাবটা এড়িয়ে গেলেন ক্যামারেট, 'তবে দু'তিন সপ্তার বেশি না।'

'সর্বনাশ! তাহলে?' ঘাবড়েই গেলেন বারজাক।

'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?' অভয় দিলেন ক্যামারেট, 'আগামী দু'দিনের মধ্যে একটা হেলিপ্লেন তৈরি হয়ে যাবে। তারপর বারো তারিখে রাতেই মহড়া দেয়া হবে।'

'তা না হয় হলো।' আশঙ্কা একটুও কমল না বারজাকের। 'কিন্তু একটা প্লেনে করে ফ্যাক্টরির সমস্ত লোককে নিরাপদ জায়গায় চালান করতে পারবেন? লোকসংখ্যা কত ফ্যাক্টরির?'

'মেয়েদের আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শ'দেড়েক,' বললেন ক্যামারেট। 'একবারে দশজনের জায়গা হবে এই প্লেনটায়। এখান থেকে আকাশপথে সায়ের দূরত্ব দু'শো মাইল, টিম্বাকটু চারশো। পনেরো বারে মোট দেড়শো লোককে সায়ে পৌঁছাতে হেলিপ্লেনের লাগবে পাঁচদিন। যদি টিম্বাকটু যেতে চান, দিন আটেক।'

একটু স্বস্তি পেলেন বারজাক। খুব একটা খারাপ প্ল্যান নয়।

মাত্র দুটো দিনই যেন কাটতে চায় না আর। সবাই নানা রকম চিন্তায় চিন্তিত, একজন ছাড়া। মঁসিয়ে পঁসি। সারাক্ষণই বাগানের ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, মুলোর মাপ নিচ্ছেন ভদ্রলোক, আর কি সব হিসেব লিখছেন ডায়ারিতে। চাতোন্নে আর ফ্লোরেন্স জিজ্ঞেস করে জানল, পরিসংখ্যানবিদ অঙ্ক কষে দেখছেন, ওইটুকু

জায়গায় যদি অত সব্জী ফলে তো গোটা নাইজারে কতটা জন্মানো যাবে, এবং তাহলে কত লোকের ঠাঁই হওয়া সম্ভব। পুরো হিসেবটাই শুনতে হলো ডাক্তার আর সাংবাদিককে। পঁসির হিসেব মতে, প্রতিদিন বারো কোটি বারো হাজার টন সব্জী ফলবে নাইজারে। জন পিছু কত সব্জী লাগবে জানা থাকলে এই পরিমাণ খাবারে কতজন লোকের চলবে, হিসেবটা খুব সোজা। হিসেবটা শুনিয়েই দিতে চাইলেন পঁসি। কিন্তু গম্ভীর মুখে সরে এলেন ডাক্তার আর সাংবাদিক। আড়ালে এসেই ফেটে পড়লেন অট্টহাসিতে।

'ব্যাটা ভাঁড়!' বললেন চাতোন্নে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে জিভ কাটল ফ্লোরেন্স, 'আস্তে বলুন, ডাক্তার। মঁসিয়ে পঁসি না আবার শুনে ফেলেন। তাহলে ক'জন ভাঁড় থাকা সম্ভব পৃথিবীতে, শুরু করে দেবেন হিসেব।'

খুব ধীরে কাটছে বন্দীদের সময়। ইতোমধ্যেই একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল পাম্প। খুব খারাপ সংবাদ। পাম্প খারাপ হয়ে গেলে পানি পাওয়া যাবে না। ব্যাপার কি? শোনা গেল, পানি টেনে তোলার ক্ষমতা হারিয়েছে পাম্প।

পিস্টন খারাপ হয়ে গেছে হয়তো। খুলে দেখার আদেশ দিলেন ক্যামারেট। খোলা হলো। সত্যিই। পিস্টনই। তবে এমন কিছু নয়। সামান্য জখম হয়েছে। অল্প সময়েই সারিয়ে নেয়া যাবে।

পরদিন সকালে বাগানে এসে জমায়েত হলো বন্দীরা। কথা রেখেছেন ক্যামারেট। ঠিক সময় মত তৈরি হয়ে গেছে হেলিপ্লেন।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল এঞ্জিনীয়ার। এঞ্জিন চালু করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ভর করে শূন্যে উঠে পড়ল আকাশযান। ক্রমেই উঠে গেল আরও উঁচুতে। ফ্যাক্টরির আকাশে বার কয়েক চক্কর মেরে আবার নেমে এল ধীরে ধীরে। দশজন লোক নিয়ে আবার উঠল। আবার নেমে এল নিরাপদে। আর ভাবনা নেই। এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল।

'আজ রাত ন'টায় যাত্রা করবে প্রথম ফ্লাইট।' ঘোষণা করলেন ক্যামারেট।

একটা বিশাল পাথর যেন নেমে গেল বন্দীদের বুকের উপর থেকে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সবাই। হাসি ফুটেছে মুখে। আগামী সকালেই হয়তো টিম্বাকটু চলে যেতে পারবে তারা।

ওদিকে পাম্প সারানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শ্রমিকেরা। পালাতে হবে ঠিক। কিন্তু তাই বলে ফ্যাক্টরির কাজকর্ম বন্ধ রাখার কোন মানে হয় না। কে জানে, আবার নতুন কোন বিপদ দেখা দিতে পারে। হয়তো আর যাওয়াই হলো না ফ্যাক্টরি ছেড়ে।

পিস্টন ঠিকঠাক করে আবার লাগানো হলো।

সাড়ে আটটা বাজতে বাগানে এসে হাজির হলো বন্দীরা। চাঁদ ওঠেনি। চারদিক অন্ধকার। গা ঢাকা দিয়ে উড়ে যাবে হেলিপ্লেন। প্রথম ফ্লাইটে যাবে বন্দীরা আটজন আর দু'জন ফ্যাক্টরি কর্মচারীর স্ত্রী। সবাই হাজির।

ফ্লাইট টেস্টের পর আবার ছাউনিতে ভরে রাখা হয়েছিল হেলিপ্লেন। বের করে আনার হুকুম দিলেন ক্যামারেট। বারোজন শ্রমিক গিয়ে দরজা খুলল ছাউনির।

বিপর্যয়টা ঘটল ঠিক এই সময়ই।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম সকলের। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাটিতেই বসে পড়ল কেউ কেউ।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছাউনির দিকে এগিয়ে গেল সবাই।

মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ছাউনি। সেই সঙ্গে হেলিপ্লেন।

কি করে ঘটল অঘটনটা?

মুখ আঁধার হয়ে গেছে বন্দীদের। ফ্যাক্টরির লোকেরাও চিন্তিত। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না একজন লোক।

মারসেল ক্যামারেট।

'রাবিশ সরাও।' হুকুম দিলেন তিনি। 'কি করে ঘটল এটা, জানতে হবে।'

র‍্যাবিশ সরিয়ে পরিষ্কার করতে করতে রাত এগারোটা বেজে গেল। যেখানে হেলিপ্লেনটা ছিল, মাটিতে বিশাল এক গর্ত।

'ডিনামাইট।' শান্ত স্বরে বললেন ক্যামারেট, 'কিন্তু উড়ে আসেনি নিশ্চয়। তাহলে?'

পাওয়া গেল উত্তর। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছেঁড়া হাত পাওয়া গেল। কোন এক নিগ্রোর। থেঁতলে যাওয়া মুণ্ড আর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও কিছু কিছু হদিস মিলল।

মুণ্ডটা থেঁতলে গেলেও চেহারাটা তুলনামূলকভাবে বিকৃত হয়েছে কম। জোরাল আলোয় ভাল করে দেখে নিয়ে থমথমে গলায় বলল ফ্লোরেন্স, 'চৌমৌকি বিশ্বাসঘাতক, শয়তান।'

কিন্তু ঢুকল কি করে চৌমৌকি? রহস্যটা বার করতে না পারলে আরও মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে।

আরও খোঁজা হলো রাবিশের মধ্যে। আরও গভীরে যেতে আর একটা দেহ পাওয়া গেল। শ্বেতকায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দেহের সঙ্গে জোড়া লাগানোই আছে তার। শুধু কাঁধের কাছে হাড় ভেঙেছে। পাঁজরের হাড়ও ভেঙেছে গোটা তিনেক। অজ্ঞান।

শত্রু হোক মিত্র হোক, আগে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হবে লোকটার। কথা বার করতে হবে পেট থেকে। সুতরাং বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলেন ডক্টর চাতোন্নে।

রাবিশ একেবারে সরিয়ে ফেলার হুকুম দিলেন ক্যামারেট। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কিছু পাওয়া গেল না।

যার যার কোয়ার্টারে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন লোকজনদের ক্যামারেট।

বন্দীরাও ভাঙা মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, পেছন থেকে ডাকলেন ক্যামারেট।

'শুনুন আপনারা, একটা হেলিপ্লেন গেছে বলেই বেশি ভাববেন না।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল আমিদী ফ্লোরেন্স।

'সহজ। আরেকটা বানিয়ে নেব।'

'সময় তো লাগবে?'

'তা লাগবে। এটার পার্টসগুলো তৈরিই ছিল। কিন্তু স্টকে আর নেই। পার্টস

বানিয়ে জোড়া দিয়ে আরেকটা হেলিপ্লেন তৈরি করতে দু'মাস লেগে যাবে।'

'দু'মাস!' চোখ কপালে তুলল ফ্লোরেন্স।

'এছাড়া আর উপায় নেই যখন, কি করা?' গাল চুলকালেন, 'তা হ্যাঁ, আপনারাও পালানোর এক আধটা বুদ্ধি বার করার চেষ্টা করুন। একটা মগজের চেয়ে ন'টা মগজ অনেক বেশি কাজ করবে। রাত হয়েছে। যান, শুতে যান।'

আরও দু'মাস! কিন্তু খাবার আর আধ মাসেরও নেই। চিন্তার ঝড় বইছে আমিদী ফ্লোরেন্সের মাথায়।

দশ

নিঃসীম হতাশায় ভেঙে পড়ল অভিযাত্রীরা। হাজারো ফন্দী-ফিকির করল সবাই বসে, কিন্তু দেশে ফিরে যাবার কোন সত্যিকারের সুরাহা করতে পারল না।

দুর্ভাবনায় পড়লেন মারসেল ক্যামারেটও। নতুন প্লেন তৈরি হতে কমপক্ষে দু'মাস লাগবে। এদিকে খাবার রয়েছে মাত্র পনেরো দিনের।

আরও কিছু বেশি খাবার আছে কিনা জানার জন্যে হিসেব করতে নির্দেশ দিলেন সহকারীদের ক্যামারেট। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসেব করা হলো। হায় ঈশ্বর! খাবার যে আরও কম, টেনেটুনে দিন দশেক চলতে পারে। উপায়?

কঠোর রেশনিং-এর ব্যবস্থা করে দিলেন ক্যামারেট। যতদিন বেশি চালানো যায়, লাভ।

তেরোই এপ্রিল সারাটা সকাল আর দুপুর গেল খাবারের হিসেব নিকেশ করতেই। এদিকে ডক্টর চাতোন্নের চেষ্টায় অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে বোমার আঘাতে আহত লোকটা। বিকেলের দিকে তাকে নিয়ে পড়লেন ক্যামারেট। কথা আদায় করতে হবে।

'কে তুমি?' প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন ক্যামারেট।

জবাব নেই।

আবার প্রশ্ন করা হলো। কিন্তু বন্দী একেবারে চুপ।

'চুপ করে থেকে লাভ নেই।' নরম গলায় হুঁশিয়ার করলেন ক্যামারেট, 'কথা বলিয়ে ছাড়ব আমি।'

কিন্তু মারসেল ক্যামারেটের চেহারায় ভয়ের কিছুই দেখল না লোকটা। ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

হাসলেন ক্যামারেটও। সামনের টেবিলে রাখা নিজের ব্যাগটা খুললেন। পাতলা চারটে ধাতুর পাত বের করে বন্দীর হাত পায়ের চার বুড়ো আঙুল টেপ দিয়ে আটকালেন। তামার তার লাগালেন চারটে পাতের সঙ্গেই। তারপর পাশে দাঁড়ানো দুই সহকর্মীকে আদেশ দিলেন, 'ওর হাত-পাগুলো চেয়ারের হাতল আর পায়ার সঙ্গে বেল্ট দিয়ে আটকে দাও।'

আদেশ পালন করল সহকারীরা।

মুচকে হাসলেন ক্যামারেট। ছোট একটা বাক্সের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে তারগুলো। বাক্সটার এক দিকের একটা সুইচ টিপে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মত বাঁকা হয়ে গেল বন্দীর শরীর। বার বার আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। দড়ির মত ফুলে উঠল ঘাড়ের শিরা। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ফর্সা মুখ। তীব্র যাতনায় গোঙাচ্ছে। বন্দীর দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিয়েছেন ক্যামারেট।

পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন ক্যামারেট। তারপর সুইচ বন্ধ করে দিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কথা বলা হবে?'

জবাব নেই।

আবার সুইচ টিপে দিলেন ক্যামারেট। আবার শরীর দোমড়াতে লাগল লোকটা। এবারে আরও বেশি। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ফুলে ফুলে উঠছে বুক। হাঁপানী রোগীর মত হাঁপাচ্ছে লোকটা।

সুইচ বন্ধ করলেন ক্যামারেট, 'আশা করি এবারে সুবুদ্ধি হয়েছে?'

'হ্যা···হ্যা···প্লীজ···আর না!' কথাই বলতে পারছে না লোকটা। জোরে জোরে শ্বাস টানছে।

'গুড। খামোকা কষ্ট পেলে। তা কি নাম তোমার?'

'ফারগুস ডেভিড।'

'নাম হলো নাকি এটা? এ তো দুটো ডাক নাম।'

'এই নামেই ডাকা হয় আমাকে ব্ল্যাকল্যান্ডে। আসল নাম জানার দরকার মনে করে না কেউ।'

'কিন্তু আমি মনে করছি।'

'ডানিয়েল ফ্রাসনে।'

'জাত?'

'ইংরেজ।'

'ব্ল্যাকল্যান্ডে কি কাজ করো?'

'কাউন্সিলর।'

'মানে বুঝলাম না পদটার?'

ক্যামারেটের কথায় যেন অবাক হলো লোকটা, 'বলেন কি প্রফেসর? ব্ল্যাকল্যান্ডে আছেন, অথচ এদেশে কাউন্সিলর কাকে বলে জানেন না? হিজ ম্যাজেস্টিস হ্যারি কিলারের গভর্নর, যারা তার হয়ে দেশটা চালায়, তাদের বলে কাউন্সিলর।'

'তাহলে তুমি ব্ল্যাকল্যান্ড সরকারের একজন উচ্চপদস্থ লোক?'

'হ্যা।'

'কবে চাকরিতে ঢুকেছ?'

'শহরের সৃষ্টির শুরু থেকে।'

'এর আগেই চিনতে হ্যারি কিলারকে?'

'হ্যা।'

'এখানে আসার আগে কোথায় ছিলে, কি কাজ করতে?'

'ক্যাপ্টেন ব্লেজনের দলে।'

নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল জেন। আর একজন লোক পাওয়া গেল, যে হ্যারি কিলার এবং তার ভাইকে চেনে।

'ব্লেজনের দলে?' জেরা চালিয়ে গেলেন ক্যামারেট। 'কিন্তু আমি চিনি না কেন তোমাকে?'

'কি জানি তা তো বলতে পারছি না। তবে আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছি। চেহারারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।'

'মঁসিয়ে ক্যামারেট,' কথা বলে উঠল জেন। কয়েকটা প্রশ্ন না করে আর থাকতে পারছে না সে, 'আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'বেশ তো করুন।'

'হ্যারি কিলার এসে যোগ দেবার সময়ও ক্যাপ্টেন ব্লেজনের দলে আপনি ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল জেন।

'ছিলাম।' জবাব দিল ফ্রাসনে।

'আপনি সব দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'ক্যাপ্টেন ব্লেজন নাকি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন হ্যারি কিলারকে? কেন?'

'তা তো জানি না।'

'ক্যাপ্টেনের দলে যোগ দেবার পরই কমান্ডার সেজে বসে ছিল হ্যারি কিলার, ক্যাপ্টেন ব্লেজনের পরিবর্তে, তাই না?'

'অনেকটা তাই।' অবাক হলো ফ্রাসনে। অত কথা এই পুঁচকে মেয়েটা জানল কি করে?

'খুন জখম, লুটতরাজ, গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা, ইত্যাদি সমস্ত অত্যাচার অনাচার হ্যারি কিলারের হুকুমে ঘটেছিল?'

'তাই-ই।'

'এতে কোন হাত ছিল না ক্যাপ্টেন ব্লেজনের?'

'না।'

'শুনেছেন তো আপনারা? সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল জেন, পরে কিন্তু সাক্ষ্য দিতে হবে।' আবার বন্দীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'নিজের কর্তৃত্ব হ্যারি কিলারের হাতে ছেড়ে দিলেন কেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন?'

'সেটা আমার জানার কথা নয়।' প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে ফ্রাসনে।

'কি করে মারা গেছেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন, জানেন আপনি?' আবার জিজ্ঞেস করল জেন।

'যুদ্ধ করতে করতে।'

চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল জেন। এভাবে প্রশ্ন করে লাভ নেই, বুঝল।

'আমার কথা শেষ।' ক্যামারেটের দিকে ফিরে বলল জেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন ক্যামারেট, 'এ শহরে হাজার হাজার নিগ্রো

গোলামি করছে। কোত্থেকে আনা হয়েছে এদের?'

'কেন, গ্রাম থেকে?' ক্যামারেটের প্রশ্নটা যেন নেহাতই বোকামি হয়েছে, এভাবে জবাব দিল ফ্রাসনে।

'এল কেন ওরা?'

'আসতে কি চায়! জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'এসব কাণ্ডই তাহলে করছে হ্যারি কিলার।' মুখ কালো হয়ে গেছে ক্যামারেটের, 'এই শহরে হাজার হাজার বিদেশী মেশিনপত্র আছে। কোন্ দেশের?'

'এ আবার কি প্রশ্ন! আপনি কি মনে করছেন চাঁদ থেকে আনা হয়েছে?'

'যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও। একটাও ফালতু কথা নয়, ইউরোপ থেকে?'

'হতে পারে।'

'কি করে এল?'

'ঠাট্টা করছেন? জানেন না কিছু? আরে সাহেব, জাহাজে এসেছে,··· জাহাজে।'

'এদিকে তো মাইলের পর মাইল মরুভূমি। এই পথটা জাহাজে আসেনি। তাহলে কোন্ বন্দরে মাল খালাস করা হয়েছে?'

'কোটানৌতে।'

'কোটানৌ থেকে ব্ল্যাকল্যান্ডে কারা বয়ে আনল?'

'নিগ্রোরা। উট আর ঘোড়ার সাহায্য নিয়েছে।' ধৈর্য একেবারে শেষ। এসব বেহুদা প্রশ্নের জবাব দিতে আর ভাল লাগছে না ফ্রাসনের।

'নিগ্রো, না? তাহলে পথে নিশ্চয় অনেক নিগ্রো মারা গেছে। যা দুর্গম পথ!'

'তা তো মরবেই। হাজার হাজার কালো কুত্তা মরেছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ডিম থেকে মাছির বাচ্চার মত কোটি কোটি জন্মায় ওরা।'

রাগে জ্বলে উঠলেন ক্যামারেট। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেশিনগুলো কিনে আনা হয়েছিল নিশ্চয়?'

'এ তো মহা মুশকিল দেখছি। ওরা কি আমাদের বাপ লাগে যে মুফতে দিয়ে দেবে?'

'তাহলে তো প্রচুর টাকা হ্যারি কিলারের?'

'তো? আপনার কি ধারণা? এত টাকা আছে, কোনদিন ফুরাবে না।'

'এল কোত্থেকে এত টাকা?'

আর ধৈর্য রাখতে পারল না ফ্রাসনে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ন্যাকামি হচ্ছে? হেলিপ্লেনগুলো কেন বানিয়েছিলেন, জানেন না? ওই প্লেনে করেই আমাদের নিয়ে বিশাগো আইল্যান্ডস-এ যায় মাস্টার। সেখান থেকে জাহাজে করে ইউরোপ। তারপর আর টাকার চিন্তা! শুধু বুদ্ধি আর সাহস থাকলেই হলো। বড়লোকগুলোর ট্যাঁক আর ব্যাঙ্কের আয়রন সেফ খালি করতে কতক্ষণ? ইংল্যান্ডের প্রায় ব্যাঙ্কেই হানা দিয়েছি আমরা।'

লজ্জায় কারও দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছেন না যেন ক্যামারেট। অমন একটা ডাকাতের সাগরেদী করেছেন এতদিন, ভাবতেই মাথা কাটা যাচ্ছে তাঁর। বন্দীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বছরে ক'বার যাও?'

'নাহ, জ্বালালেন! তা তিন চারবার তো যেতেই হয়।'

'শেষ কবে গেছ?'

'মাস চারেক আগে।'

'এবারে কোন ব্যাঙ্ক?'

'আমি যাইনি। শুনেছি ইংল্যান্ডের একটা ব্যাঙ্ক।'

মাথা নিচু করে কি ভাবছেন ক্যামারেট। মনে হচ্ছে এক ধাক্কায় দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে। হঠাৎই মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপাতত কতজন নিগ্রোকে খাটানো হচ্ছে?'

'চার হাজারের ওপরে।'

'এদেরকে নিশ্চয় হাঁটিয়ে আনা হয়েছে?'

'না। এখন আর অত ঝামেলা করার দরকার হয় না। সোজা হেলিপ্লেনে করে তুলে নিয়ে আসা হয়।'

লম্বা করে শ্বাস ফেললেন ক্যামারেট, 'ফ্যাক্টরিতে ঢুকলে কি করে কাল?'

দ্বিধায় পড়ল ফ্রাসনে। জবাব দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে টেবিলে রাখা আজব বাক্সটার দিকে চোখ পড়ল। আর দ্বিরুক্তি না করে জবাব দিল, 'রিজারভয়েরের মধ্যে দিয়ে।'

'রিজারভয়েরের মধ্যে দিয়ে?' অবাক হলেন ক্যামারেট।

'গত পরশুর আগের দিন ওয়াটার গেট বন্ধ করা ছিল। পানি তুলতে পারেনি পাম্প এবং এতে পাম্পের পিস্টনের ক্ষতি হবার কথা। হয়তো হয়েছিলও, নাকি?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ক্যামারেট।

'এতে প্যালেসের রিজারভয়ের খালি হয়ে যায়, কারণ প্যালেস রিজারভয়েরে পানি আসে এসপ্ল্যানেডের ওয়াটার পাইপ দিয়ে। এটার যোগাযোগ আছে ফ্যাক্টরির সাথেও। কারেন্ট বন্ধ করে দিতেই পানি আসা বন্ধ হয়ে গেল প্যালেসে। আপনার পাম্পও বন্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে, পিস্টন নষ্ট হয়ে। ফলে শুকিয়ে গেল ওয়াটার পাইপ। এর ভেতর দিয়ে তখন আমার আর চৌমৌকির আসতে কোন অসুবিধেই হয়নি।'

'হুঁ?' আর প্রশ্ন করলেন না ক্যামারেট।

১৪ এপ্রিল। ফ্যাক্টরি ঘিরে পাহারা দিচ্ছে মেরি ফেলোরা।

এসপ্ল্যানেড আর সার্কুলার রোডে গিজ গিজ করছে ওরা। ফ্যাক্টরির ভেতরের লোকেদের খাবার না ফুরানো পর্যন্ত থাকবে, বোঝাই যাচ্ছে।

সাঁঝের দিকে একটা মতলব এল আমিদী ফ্লোরেন্সের মাথায়। টোনগানের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর সঙ্গীদের নিয়ে গেল ক্যামারেটের কাছে। জরুরী আলোচনা করবে।

ফ্রাসনেকে জেরা করার পরই যে নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন ক্যামারেট, আর বেরোননি। একটা কথাই বার বার খোঁচাচ্ছে তাকে, তাঁরই জন্যে ব্ল্যাকল্যান্ড সৃষ্টি হয়েছে। হয়েছে অত অনাচার। লুট হয়েছে ব্যাংক। খুন হয়েছে হাজার হাজার লোক। নিপীড়িত হয়েছে, হচ্ছে অগুনতি নিগ্রো।

ঘরে ঢুকেই বেয়ারার কাছে জানল ফ্লোরেন্স, ফ্রাসনেকে জেরা করে আসার পর

থেকে একটা দানাও মুখে তোলেননি ক্যামারেট। তাই আগে খাবার আনিয়ে জোর করে খাওয়াল তাঁকে। তারপর বলল, 'এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় বের করেছি।'

'কি?'

'আমাদের হাতেও প্রচুর সৈন্য আছে।'

'অ্যাঁ!' কিছুই বুঝতে পারলেন না ক্যামারেট।

'কেন চার হাজার নিগ্রো দাস? মেয়ে দাসের সংখ্যাও দেড় হাজার।'

'কিন্তু ওদের হাতে অস্ত্র কোথায়?' কথা বললেন এবারে বারজাক।

'ওদের সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে। তারপর অস্ত্র চালান দিতে হবে।'

'বলা সোজা।'

'কাজেও সোজাই।'

'যেমন?'

'যেমন আগে যোগাযোগ করতে হবে। টোনগানেকে দিয়েই করাতে হবে কাজটা।'

'কিন্তু টোনগানে যাবে কি করে? ফ্যাক্টরি তো ঘিরে রেখেছে মেরি ফেলোরা?'

'সদর দরজা দিয়ে তো আর বেরোচ্ছে না। যাবে সার্কুলার রোড আর পাঁচিলের তলা দিয়ে।' বলে ক্যামারেটের দিকে তাকাল ফ্লোরেন্স।

গভীর চিন্তায় মগ্ন বিজ্ঞানী।

ডাকল ফ্লোরেন্স, 'একটা সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিতে পারবেন না, মঁসিয়ে ক্যামারেট? ফ্যাক্টরি আর টাউনের তলা দিয়ে সার্কুলার রোড পেরিয়ে গিয়ে খোলা মাঠে উঠবে সুড়ঙ্গের মুখ?'

'সোজা কাজ।' মাথা তুললেন ক্যামারেট।

'কয় দিন লাগবে?'

'এটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।' আবার কি ভাবলেন ক্যামারেট। 'মেশিনের সাহায্যে কাটতে সুবিধে হবে। সময়ও লাগবে কম। অমন মেশিন বানিয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে··· তা, দিন পনেরো তো লাগবেই।'

'তার মানে এমাস শেষ হবার আগেই হয়ে যাবে?'

'যাবে।'

আবার চাঙা হয়ে উঠেছে ক্যামারেটের মস্তিষ্ক। সমাধান পেয়ে গেছেন। আবার কমে আসছে যেন বয়েস।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল ফ্লোরেন্স, 'সুড়ঙ্গ খুঁড়তে নিশ্চয়ই সব লোক দরকার নেই আপনার?'

'অনেককে দরকার।'

'বাকি যারা থাকবে তাদের সাহায্যে পনেরো দিনে তিন চার হাজার অস্ত্র বানানো যাবে?'

'আগ্নেয়াস্ত্র সম্ভব না।'

'ছুরি, তরোয়াল, কুঠার, গদা, বল্লম?'

'সম্ভব।'

'নিগ্রোদের কোয়ার্টারে এসব অস্ত্র পাঠানো সম্ভব, হ্যারি কিলারের চোখ এড়িয়ে?'

'শক্ত কাজ।' আবার কি ভাবলেন ক্যামারেট, 'তবে অসম্ভব নয়। রাতের অন্ধকারে পাঠাতে হবে।'

চেপে রাখা শ্বাসটা বড় করে ফেলল ফ্লোরেন্স, 'তাহলে বেঁচে গেলাম। আমার প্ল্যান শুনুন। সুড়ঙ্গ পথে মাঠে বেরিয়ে যাবে টোনগানে। ভোর হলে, নিগ্রোরা মাঠে আসতে শুরু করলেই দলে ভিড়ে যাবে ও। সেই রাতেই শহরে ঢুকবে অন্যদের সঙ্গে। হ্যারি কিলারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে নিগ্রোদের। এমনিতেই বারুদ হয়ে আছে ওরা। আগুনের ফুলকির ছোঁয়া লাগলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। এর পর আমাদের দায়িত্ব শুধু ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া।'

আর কোন কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না ক্যামারেট। সামনের টেবিলে গিয়ে নকশা আঁকতে বসে পড়লেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটি খোঁড়ার মেশিন তৈরি করতে হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। আবার হাসি ফুটেছে মুখে। চমৎকার পরিকল্পনা করেছে সাংবাদিক।

নতুন করে হেলিপ্লেন তৈরির কাজে লেগেছিল ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা। সে-কাজ বাদ দিয়ে দিল। অন্য কাজে হাত লাগাল এবার। একদল হাত লাগাল অস্ত্র তৈরির কাজে। অন্যদল মাটি খোঁড়ার মেশিন তৈরিতে।

দ্রুত এগিয়ে চলল কাজ।

অদ্ভুত এক মেশিন তৈরি করে নিল তারা প্রফেসর মারসেল ক্যামারেটের সহায়তায়। ইস্পাতের এক বিশাল শংকু। পনেরো ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া। সারা শরীরে পেঁচানো খাঁজ কাটা, ঠিক যেন একটা অতিকায় স্ক্রু। ভেতরে বসানো একটা মোটর বন বন করে ঘোরাবে স্ক্রু-র সামনের দিকটা। মাটি কেটে ঢুকে যাবে চোখা মাথাটা। আলগা মাটি স্ক্রু-র দেহের ভেতরের পাইপ দিয়ে পেছনে চলে আসবে। কেঁচোর মলত্যাগ করার মত বেরিয়ে যাবে বাইরে। ফলে দ্রুত মাটির আরও গভীরে এগিয়ে যাবে বিশাল স্ক্রুটা। প্রফেসরের অকল্পনীয় ক্ষমতাশালী ব্রেনের আরেকবার তারিফ করল অভিযাত্রীরা।

ফ্যাক্টরির পাঁচিলের ধার ঘেঁষে গাঁইতি কোদালের সাহায্যে বিশাল এক কুয়ো খুঁড়ে ফেলা হয়েছে আগেই। ওই কুয়োর ভেতরে এবারে নামিয়ে দেয়া হলো যন্ত্রটা। মোটর চালু করতেই মাটিতে কামড় বসাল অতিকায় স্ক্রু। দ্রুত ঢুকে যেতে লাগল মাটির গভীরে।

সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল কাজ।

তিরিশ তারিখ নাগাদ মাঠের তলায় এসে গেল স্ক্রু। এবারে মাটি ফুঁড়ে বের করতে হবে। কাজটা করা হবে রাতের অন্ধকারে। যেন কারও চোখে না পড়ে। খোলা মাঠে নয়, একটা ছোট ঝোপের ভেতর দিয়ে খোলা হবে সুড়ঙ্গ মুখ, ঠিক করা হলো। ওদিকে অস্ত্র তৈরির কাজও প্রায় শেষ।

আরেকটা জিনিস শেষ হয়েছে তিনদিন আগেই। খাবার। ক্ষুধার জ্বালা সবচেয়ে বড় জ্বালা। মানুষের পাথর কঠিন বিশ্বাসে চিড় ধরাতে যথেষ্ট। মারসেল

ক্যামারেটকে যারা দেবতাজ্ঞানে পুজো করত এতদিন, তাদের অটল বিশ্বাসেও চিড় ধরতে আরম্ভ করেছে। সংশয় দেখা দিয়েছে মনে। সত্যিই কি তাদের বাঁচাতে পারবেন অসামান্য প্রতিভাশালী লোকটা?

জেনের ওপরই বেশি চটে গেল ফ্যাক্টরির ওয়ার্কাররা। ভালই তো ছিল তারা। এই জেন হ্যারি কিলারকে বিয়ে করতে না চাওয়ায়ই তো এত বিপত্তি। বাচ্চাকাচ্চাগুলো পর্যন্ত ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে গেছে।

জেনের কানেও এসে পৌঁচেছে কানাঘুসো। ওয়ার্কারদের হাবভাব, বাঁকা চাহনি, চাপা কথা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, তাদের দুরবস্থার জন্যে তাকেই দায়ী করছে ওরা।

ঠিক করল জেন, হ্যারি কিলারের কথাই শুনবে। অন্তত এই নিরপরাধ লোকগুলো তো বাঁচবে এতে। কিন্তু শুনেই চেঁচিয়ে উঠল সেন্ট বেরেন। রেগে উঠে চেঁচাতে লাগল আমিদী ফ্লোরেন্স। খেপে গেলেন বারজাক। এই হারে ভাবনা চিন্তা করলে ঠিক কতদিনে জেন ব্লেজনের শরীরে আর এক ছটাক মাংসও থাকবে না, হিসেব করে বার করে ফেললেন পঁসি। কথাটা ডাক্তারকে শোনাতে যেতেই সোজা হাঁকিয়ে দিলেন চাতোন্নে, 'যান তো, মঁসিয়ে। দেখুন গিয়ে, অঙ্ক দিয়ে নিজের পেট ভরাতে পারেন কি না।'

রাগ করলেন না পঁসি। কিন্তু বুঝতেও পারলেন না, হিসেব শুনিয়ে এমন কি অন্যায় করেছেন তিনি। জেনের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেই হিসেবটা তিনি করেছেন। তাতে অমন কি দোষ হলো? মনে মনে স্থির নিশ্চিত হলেন, দুনিয়ার তাবৎ ডাক্তারগুলোর মাথা খারাপ।

জেনকে যেতে দেয়া হলো না কিছুতেই। সুড়ঙ্গও খোঁড়া হয়ে গেছে। এখন আর নিজেকে আহুতি দেয়ার কোন মানেই হয় না।

সাঁঝ হলো। আবার চালু করা হলো স্ক্রু। বন বন করে মাটি কেটে উপরের দিকে উঠে গেল যন্ত্রটা। ঠিক যেখানে অনুমান করা হয়েছিল, একটা ঝোপের ভেতরে বেরিয়ে এল মাটি খুঁড়ে।

সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পালা শেষ। এবারে আসল কাজ। সেই রাতেই যথারীতি কর্তব্য কর্ম বুঝিয়ে দিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে পাঠানো হলো টোনগানেকে।

১ মে সকাল থেকেই আরম্ভ হলো প্রতীক্ষা। কোন খবর নেই। সংকেত এল না ২ মে-ও। ধরা পড়ে গেল না তো টোনগানে? দমে গেল সবাই। কিন্তু আশা ছাড়ল না। আকাশে এখন শুক্ল পক্ষের চাঁদ। হয়তো অন্ধকারের আশায় আছে টোনগানে।

৩ মে সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। রাতে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সবাই আশা করল, আজ সাড়া দেবে টোনগানে। কিন্তু বৃথাই।

দুশ্চিন্তা আরও চেপে বসল ফ্যাক্টরিবাসীর মনে। ভেগে গেল না তো টোনগানে? নাকি ধরাই পড়ল।

৪ মে। সময় আর কাটতেই চায় না। ক্ষুধায় জ্বলে যাচ্ছে পেট। টোনগানেরও সাড়া নেই।

৫ মে। অবস্থা আরও শোচনীয়। না খেয়ে থেকে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে ফ্যাক্টরিবাসী। সারাক্ষণই কাঁদছে বাচ্চারা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাচ্চারা কাঁদার শক্তিও হারিয়েছে। ছুটোছুটি করছে মায়েরা। পুরুষদের কাছে জানতে চাইছে, খাবার পেতে আর কত দেরি। এখানে সেখানে জটলা করছে শ্রমিক-কর্মচারীরা। ওয়ার্কশপে কেউ নেই। কাজকর্ম বন্ধ। আর বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা এই পরিস্থিতিতে কাটলে আত্মসমর্পণ করে বসবে ওরা। কিন্তু তাহলেও কি রক্ষা আছে? ধরে ধরে জবাই করবে সব ক'জনকে হ্যারি কিলার। যত নষ্টের মূল ওই জেন মেয়েটা। আহা, রূপের কি গুমোর! কেন বাপু, এমন কি খারাপ হ্যারি কিলার? তাছাড়া ব্ল্যাকল্যান্ডের মত অমন একটা শহরের সম্রাট সে। অনেক মেয়েই তাকে স্বামী হিসেবে পেলে বর্তে যাবে।

শুনিয়ে শুনিয়েই জেনকে গালাগালি করতে লাগল শ্রমিকেরা। অনুশোচনায়, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো জেনের।

সকাল থেকেই টোনগানের সিগন্যালের প্রতীক্ষায় আছে ফ্যাক্টরিবাসী। এক একটা মুহূর্ত এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। সময় আর কাটতেই চায় না। ধুঁকে ধুঁকে শেষ পর্যন্ত গেল দিনটা। রাত এল। আকাশে ঘন মেঘ আজও। সাতটা বাজল, আটটা। কিন্তু কই, কোনরকম সাড়া তো দিচ্ছে না টোনগানে?

সাড়া এল শেষ পর্যন্ত। নিবিড় আঁধারে টিমটিম করে জ্বলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো। নিগ্রো কোয়ার্টারের পাঁচিলে বসে সিগন্যাল দিচ্ছে টোনগানে। আনন্দে দুলে উঠল সবার মন। দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে।

টাওয়ারে আগেই একটা বিচিত্র কামান তুলে রাখা হয়েছে। এখন সেটা দাগা হলো। একটা বিশাল কাঠের গোলা উড়ে গেল নিগ্রো কোয়ার্টার লক্ষ্য করে। পেছনে লেজের মত লম্বা দড়িটাও ছুটল টান টান হয়ে। নিগ্রো কোয়ার্টারের পাঁচিলে আটকে ফ্যাক্টরির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দড়ির সেতু তৈরি হবে। কিন্তু জায়গামত গিয়ে পড়বে তো গোলাটা?

এই দড়ির সেতুর ওপরই নির্ভর করছে সব। তাই কামান দাগার ভার নিয়েছেন মারসেল ক্যামারেট নিজে। কত কোণ করে, কতখানি হাওয়ার চাপে কামান দাগলে ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়বে গোলা, আগেই হিসেব করে বের করে রেখেছেন।

পাঁচিলের ওপারে গিয়ে পড়ল গোলা। ঢিল হয়ে গেল দড়ি। তবে কি ঠিক জায়গা মত পড়েনি? হতাশ হলেন ক্যামারেট। আবার কামানে গোলা পুরে তৈরি হচ্ছেন, এমনি সময়ে টান টান হয়ে গেল দড়ি। নাহ্ ঠিক জায়গা মতই পড়েছে। পাঁচিলের ওপাশে নিশ্চয় মাটিতে গাড়া কোন খুঁটির সঙ্গে দড়ির মাথা বেঁধে দিয়েছে টোনগানে।

এই দড়িকে নির্ভর করেই বানানো হলো অপেক্ষাকৃত সরু দড়ির কপিকল। ওপাশ থেকে টানলে মালের বোঝা নিয়ে চলে যাবে সরু দড়িতে বাঁধা জালের ঝোলা। এপাশ থেকে টানলেই আবার ফিরে আসবে। প্রথমেই পাঠানো হলো বিশাল এক বাণ্ডিল বারুদ। তারপর একে একে গেল চার হাজার বল্লম, তরোয়াল, কুঠার, গদা। খুবই দ্রুত কাজ সারতে হলো। কখন আবার হ্যারি কিলারের লোকের চোখে পড়ে যায়। রাত এগারোটা নাগাদই অস্ত্র পাচার শেষ হয়ে গেল।

নিজেরা তৈরি হতে শুরু করল এবার ফ্যাক্টরিবাসীরা। যে যা অস্ত্র পেল, হাতে তুলে নিল। মেয়েরাও বাদ গেল না। ফ্যাক্টরির সদর দরজার সামনে এসে হাজির হলো সবাই।

বারজাক, চাতোন্নে, সেন্ট বেরেন, আমিদী ফ্লোরেন্স, এমনকি পঁসি পর্যন্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। এমন সময় খেয়াল হলো সবার, তাই তো, জেন কই?

ফ্যাক্টরির সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো তাকে। কিন্তু কোথাও নেই মেয়েটা!

যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে জেন ব্লেজন!

এগারো

ভেতর থেকে সদর দরজা খোলার পদ্ধতি জানাই আছে জেনের। গত কয়েক দিন ফ্যাক্টরিতে থেকে থেকে অনেক কিছুই জেনে নিয়েছে সে। তাই বেরোতে কোন অসুবিধেই হলো না। অন্ধকার রাত। তাছাড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা-উত্তেজনায় জেনের কথা মনেই নেই কারও। তাই অন্ধকার নামার পর, টোনগানের কাছ থেকে সিগন্যাল পাবার আগেই বেরিয়ে এল জেন।

মনস্থির করে নিয়েছে জেন, হ্যারি কিলারের কাছেই যাবে সে। আশা করছে বোঝাতে পারবে কিলারকে। জেনের কথা শুনবে হয়তো খুনেটা। এবং তাহলেই ফ্যাক্টরির লোকগুলোকে না খাইয়ে মরার কবল থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে এসে দশ গজ এগোতেই মেরি ফেলোদের চোখে পড়ে গেল জেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল লোকগুলো। জেনকে চেনে ব্ল্যাকল্যান্ডের সবাই। স্বয়ং মাস্টারের হবু বধূ। সোজা কথা?

সোজা হ্যারি কিলারের কাছে নিয়ে যাবার আদেশ দিল জেন মেরি ফেলোদের। সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে প্যালেসে।

নবরত্ন নিয়ে তখন মদের আসর বসিয়েছে হ্যারি কিলার। জেনকে ঢুকতে দেখে দশজনেরই চোখ ছানাবড়া। ব্যাপারটা কি?

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না হ্যারি কিলার। জেনের পিছনে চাইল, পুরুষ সঙ্গীগুলোও আছে কিনা। না, নেই।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল নবরত্ন। কপালে হাত ঠেকিয়ে সম্মান জানাল।

'তা একলা কেন?' ঝুঁকে বসে জিজ্ঞেস করল হ্যারি কিলার।

'বিয়ে তো একলাই করব। অন্যদের দিয়ে কি হবে?' গলা কাঁপছে জেনের। না খেয়ে খেয়ে শরীর দুর্বল। উত্তেজনার চরমে পৌঁচেছে স্নায়ুমণ্ডলী। দশজন লোকের রক্ত পানি করা লোলুপ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ভাবল, ফ্যাক্টরি ছেড়ে এসে কাজটা ভাল করেনি সে।

'তা ফ্যাক্টরি থেকেই তো এলে?' জিজ্ঞেস করল হ্যারি কিলার।

'হ্যাঁ।'

'কেন?' রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ হ্যারি কিলারের। বুঝল জেন, আত্মাহুতি দিয়েও সঙ্গী এবং ফ্যাক্টরির লোকজনদের বাঁচাতে পারবে না।

রুদ্ধ স্বরে বলল, 'বললামই তো। নিজেকে সঁপে দিতে।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠল যেন হ্যারি কিলার। 'তাই নাকি? চমৎকার!' নবরত্নের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা যেতে পারো এখন!'

নোংরা হাসি হাসল নবরত্ন। টলতে টলতে বেরিয়ে গেল সব ক'জন।

'চৌমৌকি তো খণ্ডবিখণ্ড। নিজের চোখে দেখেছি টুকরোগুলো। আমাকে দেখানোর জন্যেই বুঝি পাঁচিলের এপারে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে? ভাল, ভাল। তা অন্য লোকটাকে কি করা হয়েছে?'

'চিকিৎসা করছেন তার ডক্টর চাতোন্নে।'

'যেটা বানিয়েছিল ক্যামারেট, হেলিপ্লেনটার কি অবস্থা?'

'ডিনামাইট মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে চৌমৌকি।'

'গুড।…তারপর? তুমি এসেছ নিজেকে সঁপে দিতে? কারণ?'

'অন্যদের বাঁচাতে।'

'অসম্ভব। অর্থাৎ, সবকটার অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে?' হাসল হ্যারি কিলার।

'সবাই মরার পথে।' চোখ নামিয়ে নিল জেন।

'গুড! ভেরি গুড! এই তো চাইছিলাম!' বিশাল এক গেলাসে মদ ঢেলে নিল হ্যারি কিলার। এক চুমুকে শেষ করল সবটুকু। চোখে-মুখে ঝরে পড়ছে বীভৎস আনন্দ।

'এরপর? বলে যাও।'

'আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন? আমি রাজি। তবে এক শর্তে। আমার বন্ধুদের সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে।' বলছে বটে, কিন্তু লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে গেছে মুখ।

'শর্ত আবার কিসের? তুমি না এলেও গাধাগুলোকে বের করে আনার ক্ষমতা আমার আছে। শুধু খেলা দেখছিলাম এতদিন। আগামীকালই ধরে এনে জবাই করতাম।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল হ্যারি কিলার। অহংকারে ফেটে পড়তে চাইছে। টলতে টলতে জেনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল, 'ওদের কথা বাদ দাও। তোমাকে কে বাঁচাবে এখন?'

আস্তে আস্তে পিছু হটে গেল জেন। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকতেই আঁতকে উঠল। একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়েছে হ্যারি কিলার। নাক-মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে জেনের কপালে।

হঠাৎই কি মনে করে দাঁড়িয়ে গেল কিলার। জেনের চোখে চোখে চাইল। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা, দেখে মজা লাগছে তার।

হা হা করে হাসল হ্যারি কিলার, 'বিয়ে করতে এসেছ। হবু স্বামীকে দেখে ভয় কি? এসো, কাছে এসো।'

'কিন্তু, কিন্তু এভাবে অপমান করছেন কেন?' সাংঘাতিক কাঁপছে জেনের গলা।

'অপমান!' হঠাৎই যেন চৈতন্য হলো হ্যারি কিলারের। 'আচ্ছা ঠিক আছে। বিয়ে করব কিনা, ভেবে দেখব কাল। এখন এসো একটু ফুর্তি করা যাক।'

এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসল হ্যারি কিলার। ধীরপায়ে এগিয়ে গেল জেন। গেলাসে মদ ঢেলে দিতে শুরু করল। মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরেই নাক ডাকাতে শুরু করল হ্যারি কিলার।

খুনেটার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবার অদম্য ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল জেন। এখনও সময় আসেনি। তার চেয়ে আগে বরং কিছু খেয়ে নেয়া যাক।

পাশের ঘরে চলে এল জেন। টেবিল ভর্তি প্লেটে প্রচুর খাবার। হ্যারি কিলারের রাতের খাবার পরও এখনও অন্তত দশজনের খাবার অবশিষ্ট আছে। গোগ্রাসে গিলতে লাগল জেন।

ক্ষুধা প্রশমিত হতেই আবার হ্যারি কিলারের বসার ঘরে ফিরে এল জেন। ঘুমের ঘোরে গড়িয়ে চেয়ারের উপরেই কাত হয়ে গেল হ্যারি কিলার। ঠং করে কি যেন একটা পড়ল মেঝেতে।

এগিয়ে গিয়ে দেখল জেন, একটা চাবি। হঠাৎই পেছনের দরজা দিয়ে ওই ঘরটায় হ্যারি কিলারের যাবার কথা মনে পড়ে গেল, রহস্যময় কাতরানি শোনা যায় যে ঘর থেকে।

কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করেই মেঝে থেকে চাবিটা কুড়িয়ে নিল জেন। পেছনের দরজা খুলে ভেতরে পা দিল। প্রথমে একটা চাতাল, তারপর সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। পেছনে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে আরেকটা চাতালে নেমে এল জেন। আরও গোটা কয়েক সিঁড়ি বেয়ে পাতাল-অলিন্দে। একটা দরজার সামনে বসে আছে একটা নিগ্রো গোলাম। জেনকে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। জানে সে, এই-ই তাদের ভাবী সম্রাজ্ঞী।

ইঙ্গিতে দরজা খুলে দিতে বলল জেন। একটু ইতস্তত করল নিগ্রো গোলাম। এই ঘর অন্য কারও জন্যে খোলা মানা। তারপর ভাবল, দরজা খুলে যখন এতদূরে এসেই পড়েছে জেন, নিশ্চয় হ্যারি কিলারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই এসেছে। নইলে চাবি পেল কি করে?

আর দ্বিধা না করে কোমর থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে দিল নিগ্রো। ভেতরে উঁকি দিল জেন। অন্ধকার।

আলো জেলে দিতে বলল নিগ্রোকে জেন। সুইচ টিপতেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি, ধড়মড়িয়ে খাটের ওপর উঠে বসল লোকটা। কংকালসার দেহ। মুখে, দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখ। আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুই চোখ।

কিন্তু তবু লোকটাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না জেনের। তার ভাই, লুই ব্লেজন! পাঁচ মাস আগে ব্যাংক ডাকাতির পর নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

'ভাইয়া!' দারুণ অবাক হয়ে ডাকল জেন।

'জেন!' লুইও কম অবাক হয়নি।

খাটের কাছে ছুটে গেল জেন। দুর্বল দেহ নিয়েও এক লাফে খাট থেকে নামল লুই। জড়িয়ে ধরল দু'জনে দু'জনকে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে জেন। লুইয়ের চোখেও

পানি।

কান্নার বেগ প্রশমিত হলে আলিঙ্গনমুক্ত হলো দু'জনেই।

'তুমি এখানে এলে কি করে, ভাইয়া?' জিজ্ঞেস করল জেন।

'পাঁচ মাস আগে। সেদিন তিরিশে নভেম্বর। ছুটির সময় হয়েছে। ব্যাংকে বসে আছি। এই সময়ই আমার রুমে এসে ঢুকল একজন আজব লোক। এসেই অতর্কিতে রদ্দা মারল ঘাড়ে। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি, একটা বাক্সের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে আমাকে। হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজা।

'কতদিন ছিলাম বাক্সের ভেতর জানি না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গেলাম। তারপর একদিন বাক্স খোলা হলে দেখলাম, এই ঘরে আনা হয়েছে আমাকে। তারপর থেকেই রোজ অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে আমার ওপর।'

'কে, কে অত্যাচার করে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে জেনের পেছন দিকে তাকিয়ে রইল লুই। আতঙ্ক এসে আবার ভর করেছে দুই চোখে। ফিরে তাকাল জেন।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লোলজিহ্বা, কদাকার, রক্ত চক্ষু, কশ বেয়ে লালা গড়ানো এক নরদানব। স্বয়ং হ্যারি কিলার।

বারো

'তাই তো বলি, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ শ্রীমতীর আগমন!' দরজা জুড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যারি কিলার, 'জিজ্ঞেস করলাম, বলে কিনা, বন্ধুদের বাঁচাতে আমার কাছে এসেছে। আমাকে বিয়ে করার বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে ওদের। তখনই সন্দেহ হলো। সিংহাসন ঘরের পেছনের দরজাটার দিকে হাঁ করে অনেকদিন চেয়ে থাকতে দেখেছি ওকে। ভাবলাম, দেখি টোপ ফেলে। ইচ্ছে করেই দিলাম চাবি ফেলে। ভাব দেখালাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। আর যা ভেবেছি, তাই-ই।' কুৎসিত হাসি হাসল সে।

'তোমার সঙ্গে বিয়ে!' অবাক হলো লুই।

ঘরে এসে ঢুকল হ্যারি কিলার। জেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অত সহজেই আমার চোখে ধুলো দেবে?'

এক টানে পোশাকের ভেতর থেকে ছুরি বের করল জেন। হ্যারি কিলারের দিকে উঁচিয়ে ধরে চাপা হিসহিসে গলায় বলল, 'কাছে এসেছ কি মরেছ!'

হা হা করে হাসল হ্যারি কিলার। 'গুড! ভেরি গুড! গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটা ফুটবেই হাতে। কিন্তু কাঁটার ভয় আমি করি না, সুন্দরী।'

কথা বলছে বটে, কিন্তু আর কাছে এগিয়ে আসছে না হ্যারি কিলার।

বাঁ হাতে ভাইকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগোল জেন। 'হ্যাঁ, হ্যারি কিলার, কাছে এলেই মরবে তুমি। কলজে বরাবর ছুরির একটা খোঁচা পাওনা হয়ে গেছে তোমার অনেক আগেই। যেদিন কৌবৌতে নিরপরাধ মানুষটিকে তাঁর

বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে হত্যা করেছ...'

'কৌবৌ!' চমকে উঠল যেন লুই, 'জর্জ যেখানে...'

'মারা গিয়েছেন।' কথাটা শেষ করল জেন। 'বন্দুকের গুলিতে মারা যাননি তিনি। পেছন থেকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে। ছুরির বাঁটটা তাঁর কবরের ভেতরেই খুঁজে পেয়েছি আমি। তাতে হত্যাকারীর নাম খোদাই করা। জানো কে? এই শয়তান, পিশাচ হ্যারি কিলার।'

নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেছে হ্যারি কিলার। ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে।

'জানিস, জেন,' বলল লুই, 'ওর আসল নাম কিন্তু হ্যারি কিলার নয়। নাম শুনলে চিনতে পারবি। তুই তখন খুব ছোট, আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ও। এ তোর ভাই, উইলিয়াম ফার্নি।'

'কি বললে?' প্রায় একই সঙ্গে বলল জেন আর হ্যারি কিলার।

'হ্যাঁ, তাই। উইলিয়াম,, এ তোমার ছোট বোন, জেন।'

মাতলামি উধাও হয়েছে উইলিয়ামের চেহারা থেকে। আস্তে আস্তে ছুরি ধরা হাতটা নামিয়ে নিল জেন।

এক পা এগিয়ে এল উইলিয়াম, 'আমাকে ক্ষমা কর, বোন। প্রথম দিনই কেন নিজের পরিচয় দিসনি? কেন বলিসনি তুই লর্ড ব্লেজনের শেষের পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে? তাহলেই তো আর খামোকা অপমান হতিস না। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। আয়, আর কোন ভয় নেই তোর। আমার রাজত্বে আমারই মত সম্মানে থাকবি তুই।'

'খবরদার!' ধমকে উঠল জেন। আবার উঠে গেল ছুরি ধরা হাতটা। 'এগোলেই ছুরি মারব। আমার ভাই নও তুমি। তোমার মত নরকের কীট আমার ভাই হতে পারে না। এসব মিথ্যে, সব মিথ্যে।'

থমকে দাঁড়াল উইলিয়াম। 'তাহলে তুই আমাকে ভাই বলে স্বীকার করিস না?'

'ভাই! তোমাকে!' ওয়াক থু করে মেঝেতে থু থু ফেলল জেন, 'তোমাকে ভাই ডেকে দুনিয়ায় ভাই-বোনের সম্পর্কের সম্মান নষ্ট করব নাকি? আমার কাছে তুমি কিলার, স্রেফ হ্যারি কিলার। খুনে, শয়তান, পিশাচ, দানব, অমানুষ!'

'বটে!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল উইলিয়াম, 'আমার রাজত্বে দাঁড়িয়ে আমাকেই এত বড় কথা! দেখাচ্ছি মজা!' রাগে ফুলছে সে। ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। 'কিন্তু তার আগে শোন, পুরো ব্লেজন পরিবারটাকে ধ্বংস করে দিয়েছি আমি। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, জর্জকে আমিই খুন করেছি। কেন করব না? আমাকে কুকুরের মত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার সময় তো তোর বাবার একটুও বাধেনি। তবে তার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। জর্জকে শুধু খুনই করিনি। সঙ্গে সঙ্গে তোদের পরিবারের সুনামও ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। লোকে জানে, একভাই সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করেছে। তারপর মরেছে। আরেক ভাই ব্যাংক লুট আর গার্ডকে খুন করে পালিয়েছে। এরপর ব্লেজন পরিবারের নামে ছি ছি করছে না লোকে?'

কুৎসিত আনন্দ উইলিয়ামের চোখে-মুখে। ফেটে পড়ছে উল্লাসে।

'আমি তো তোদের প্রাসাদ ছেড়ে চলেই এসেছিলাম। এখন? এখন তো আমার কাছে মরতে এসেছিস!'

হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসল উইলিয়াম। এক পা এগিয়ে এল।

এখনও লুইকে জড়িয়ে ধরে আছে জেন। ছুরি ধরা হাতটা তেমনি উদ্যত।

'আমাকে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, টাকা রোজগার করব। কোটি কোটি টাকা। তারপর প্রতিশোধ নেব তোর বাপের ওপর। ইউরোপের তাবৎ বড় বড় লোকের কোষাগার খালি করে দিলাম ডাকাতি করে। ব্যাংকের আয়রন সেফ লুট করলাম। এরপর তৈরি হলাম প্রতিশোধ নিতে।

'খুঁজে বের করলাম জর্জ গাধাটাকে। এমন ভান করলাম, যেন অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছি। আমার কথায় ভুলে গেল সে। তার খাবারে একটু একটু করে আফিম মিশিয়ে দিতে লাগলাম। তাই খেয়ে টং হয়ে সারাক্ষণ পড়ে থাকে জর্জ। এই সুযোগে তারই সেনাবাহিনীর সাহায্যে লুটপাট চালালাম। অবশ্যই কয়েকজন বাধা দিল। ওরা সব কজন খুন হলো। অন্যেরা মোটা টাকা খেয়ে বশ্যতা স্বীকার করল।

'জর্জের নামে ঢি ঢি পড়ে গেল। তাকে দমন করার জন্যে সেনাবাহিনী এল। বুঝলাম, আর দেরি করা যায় না। সকলের অজান্তে ছুরি বসিয়ে দিলাম তার পিঠে। গোপনে নিজের হাতে কবর দিলাম। প্রচার হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা গেছে জর্জ।

'জর্জের দলে থাকতেই পরিচয় হলো গাধা ক্যামারেটটার সাথে। তবে হ্যাঁ, লোকটার প্রতিভা আছে স্বীকার করতে হবে। তাকে নিয়ে চলে এলাম এই মরুভূমিতে। মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরাল সে ঊষর মরুতে। গোড়াপত্তন করলাম এই শহরের।

'জর্জকে হত্যা করেই কিন্তু প্রতিশোধের আগুন কমেনি আমার। মাস পাঁচেক আগে আবার গেলাম লন্ডনে। ছদ্মবেশে। একটা ব্যাংক লুট করলাম। গার্ডকে খুন করলাম। ধরে নিয়ে এলাম লুইকে। আবার ঢি ঢি পড়ে গেল। লোকে ছি ছি করতে লাগল। ব্যাংক লুট করে পালিয়েছে লুই ব্লেজন। খুনও করে গেছে একটা। ব্যস, একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙে গেল তোর বাবার।

'অনেকদিন বাঁচিয়ে রেখেছি, আর না। কালই খুন করব লুইকে। আর তোকে কি করব জানিস? আমার সবচেয়ে নিচু জাতের নিগ্রো গোলামটার সঙ্গে বিয়ে দেব তোর। ছবি তুলব। সেই ছবি পাঠাব তোর বাবার কাছে। ইউরোপের সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হবে যুগল ছবি। এর পর সোজা আত্মহত্যা করবে তোর বাপ। পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ব্লেজন পরিবার।' হা হা করে হেসেই চলল উইলিয়াম।

'শুধু আজ, আজ রাতটা অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। তারপরই প্রতিশোধ নেয়া হবে। কালই…'

ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দে থমকে থেমে গেল উইলিয়াম। কান পাতল।

আবার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। এরপর তুমুল হৈ-চৈ-এর রব উঠল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে যেন জনতা থেকে থেকেই। এরপর রাইফেল আর রিভলভারের গুলির শব্দ হতে লাগল।

কান খাড়া করে শুনছে উইলিয়াম ফার্নি। জেন বা লুইয়ের দিকে যেন কোন

খেয়ালই নেই।

এই সময় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল নিগ্রো গোলামটা। আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ, 'মাস্টার!' হাঁপাচ্ছে লোকটা। 'মাস্টার, শহরে আগুন লেগেছে!'

বিচ্ছিরি গালাগাল দিতে দিতে ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল উইলিয়াম ফার্নি।

তেরো

কিসের এত শব্দ বুঝতে পারছে না লুই বা জেন কেউই। প্রাসাদের বাইরে থেকে আসছে শোরগোলের আওয়াজ। থেকে থেকেই বন্দুক গর্জাচ্ছে, বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে। বাড়ছে ক্রমেই।

হঠাৎই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল জেন। ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'হাঁটতে পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

'চলো তাহলে।'

ধরে ধরে অতিকষ্টে লুইকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল জেন। এক ছটাক শক্তি অবশিষ্ট নেই লুইয়ের শরীরে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে জেন।

বাইরে নিগ্রো গোলামটাকে আশা করছিল জেন, কিন্তু নেই।

প্রায় টেনে হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে চাতালে তুলে আনল জেন লুইকে।

ঠেলা মেরে দেখল দরজা ভেজানোই আছে। সিংহাসন ঘরে এসে ঢুকল দুজনে। সেখানেও নেই কেউ।

একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল জেন লুইকে। একাই চলল গোলমালের কারণ অনুসন্ধান করতে।

পথ চেনাই আছে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে লাগল। পুরো বাড়িটাকে নির্জন মনে হচ্ছে।

না, নির্জন নয়। সিঁড়ির একেবারে মাথায় এসে ছাদে উঁকি দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল জেন। কারা যেন কথা বলছে ছাদে। সিঁড়ি ঘরে উঠে এল সে। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। ছাদে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে নবরত্নের সঙ্গে কথা বলছে উইলিয়াম ফার্নি। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ক'জন ব্ল্যাকগার্ড আর নিগ্রো দাস। সব ক'জন গার্ডের কোমরে এক জোড়া করে রিভলভার, হাতে রাইফেল।

আঙুল তুলে দূরের কি যেন দেখাচ্ছে উইলিয়ামকে নবরত্ন। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ফার্নি। গলা ফাটিয়ে গার্ডদের কি হুকুম দিল। তারপর নবরত্নকে নিয়ে এগোল সিঁড়ি ঘরের দিকে।

ফিরে যেতে পারবে না জেন, বুঝতে পারল। তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। উপায়ান্তর না দেখে হ্যাঁচকা টানে সিঁড়ি ঘরের লোহার দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি

লাগিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্ডের দল। রাইফেলের বাঁট দিয়ে দমাদম পিটাতে লাগল।

এক চুল নড়ল না লোহার পাল্লা। নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এল জেন। ছাদ থেকে নিচের তলা পর্যন্ত একই রকম মজবুত আরও পাঁচটা দরজা আছে। নামার পথে একে একে সবকটা দরজা বন্ধ করে দিল জেন। পথে যে ক'টা ঘর পড়ল, সবকটার লোহার পাল্লা লাগানো জানালাগুলোও বন্ধ করে দিল। এক দুর্ভেদ্য কেল্লার ওপর বন্দী করে এল উইলিয়াম ফার্নি, তার নবরত্ন আর কিছু দুর্ধর্ষ গার্ডকে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে লুই। অতগুলো ভারি পাল্লা বন্ধ করতে গিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে জেন। হাত-পা কাঁপছে থর থর করে। পরিশ্রম আর স্নায়ুছেঁড়া উত্তেজনায়।

'কি হলো, জেন, অমন করছিস কেন?' জেনকে ভীষণভাবে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করল লুই।

'উইলিয়ামকে ছাদে বন্দী করে এলাম। হাঁপাতে হাঁপাতেই জবাব দিল জেন। আপাতত আমাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই তার।'

'ছাদ থেকে নেমে আসার আর কোন পথ নেই তো?' লুইয়ের কণ্ঠে সন্দেহ।

'নাহ্। থাকলেও জানি না।' অনিশ্চিত স্বর জেনের।

'অত গোলমাল কিসের বাইরে?'

'বুঝতে পারছি না। চল তো দেখি।'

ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল লুই আর জেন। পাল্লা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিয়েই বুঝল, অমন অস্থির হয়ে পড়েছে কেন উইলিয়াম। রেড রিভারের ডান পাড়ে আগুন লেগেছে। এসপ্ল্যানেড অন্ধকার। নিগ্রোদের প্রতিটা কুঁড়ের মাথায় নাচছে আগুনের লেলিহান শিখা। জ্বলছে টাউনের মাঝ বরাবর।

সিভিল বডির কোয়ার্টারেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। এগোচ্ছে মেরি ফেলোদের কোয়ার্টারের দিকে। চারদিকে ভীষণ হট্টগোল, চিৎকার, গালাগাল, হুংকার, ইত্যাদি ছাপিয়ে ক্রমাগত উঠছে রাইফেল বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষ। এক এলাহিকাণ্ড।

'বিদ্রোহ করেছে নিগ্রো দাসরা,' বলল জেন। 'কাজ হাসিল করতে পেরেছে তাহলে টোনগানে।'

'কি বলছিস? কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি!' অবাক লুই।

অল্প কথায় সব কথা ভাইকে খুলে বলল জেন। বাড়ি থেকে রওনা হবার পর আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব।

'এখন কি করবি?' জিজ্ঞেস করল লুই।

'আপাতত কিছুই করার নেই।'

হঠাৎ কি মনে হতে লুইকে বলল জেন, 'তুমি একটু বসো, দেখি কোন অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় কিনা। নিগ্রোদের কিছুটা সাহায্য করতে পারলেও লাভ হবে।'

খুঁজে পেতে পাশের একটা ঘরে একটা রাইফেল, দুটো রিভলভার আর কিছু কার্তুজ পেল জেন। ফিরে এসে দেখল, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। কাতারে কাতারে এসে এসপ্ল্যানেডে জড় হচ্ছে নিগ্রোরা। চেহারা ভয়ংকর। প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলছে যেন ওরা দাউ দাউ করে। আরও ছড়িয়েছে আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে চল্লিশটা

হেলিপ্লেনের শেড। গত দশ বছরে অকল্পনীয় যন্ত্রণা সয়েছে নিগ্রোরা, শোধ তুলছে আজ। জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে ব্ল্যাকল্যান্ড। কচুকাটা করছে ব্ল্যাকগার্ডদের নির্মমভাবে। সমানে ওদের ওপর গুলি চালাচ্ছে উইলিয়াম ফার্নির অনুচরেরা, ছাদ থেকে। কিন্তু হাজার হাজার নিগ্রোর বিরুদ্ধে মাত্র কয়েকটা বন্দুক পিস্তল কিছুই না।

হঠাৎ নতুন করে একসঙ্গে অনেক বন্দুক গর্জে উঠল। রেড রিভারের দিক থেকে। মেরি ফেলোরা আসছে। একজোট হতে পেরেছে ওরা হয়তো এতক্ষণে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে এসপ্ল্যানেডের দিকে। কাতারে কাতারে লুটিয়ে পড়ছে নিগ্রো দাসরা, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। জানে ওরা, ধরা পড়লে গরুছাগলের মত জবাই হবে। তার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা ভাল। কে জানে, দুর্ভাগ্যের দিন শেষ হয়ে থাকলে জিতেও যেতে পারে ওরা।

কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক-বল্লম যা করতে পারে, এক্ষেত্রেও তার বেশি কিছু হচ্ছে না। নিগ্রোদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। মরতেই চলেছে তারা। ক্রমেই আরও এগিয়ে আসছে মেরি ফেলোরা। আরও বেশি করে মারা যাচ্ছে নিগ্রো দাসের দল।

হঠাৎই শোনা গেল প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণের শব্দ। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আকাশে উঠে গেল সিভিল বডির কোয়ার্টারের পাঁচিলের একটা অংশ। সেই সঙ্গে কিছু ঘরবাড়ি।

কি করে ঘটল এই রহস্যজনক বিস্ফোরণ জানার দরকার নেই নিগ্রো দাসেদের, পথ খোলা পেয়ে সোজা ছুটে গেল মাঠের দিকে, পাঁচিলের ভাঙা অংশ ডিঙিয়ে। হাজারে হাজারে। একেবারে একা হয়ে গেল এসপ্ল্যানেডে মেরি ফেলোরা। নিগ্রোদের তাড়া করার কথা ভুলেই গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে ওরা এই হঠাৎ বিস্ফোরণে।

এই সময় আবার ঘটল বিস্ফোরণ। তারপর আর একবার। প্রথম ধ্বংসস্তূপের ডাইনে এবং বাঁয়ে। যে-ই ঘটাচ্ছে বিস্ফোরণ, ঘটাচ্ছে প্ল্যানমাফিক, একেবারে ঘড়ি ধরে ধরে।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার ঘটল বিস্ফোরণ। আবার। সবই সিভিল বডিদের কোয়ার্টারে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মেরি ফেলোরা। ক্রমেই এসপ্ল্যানেডের পেছনে প্যালেসের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল ওরা। ওদিকে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে সিভিল কোয়ার্টার। ঘটনাটা কি?

রাত ভোর হলো। এসপ্ল্যানেডে ভয়াবহ দৃশ্য। শত শত মানুষের লাশ পড়ে আছে মাটিতে। সাদা কালোয় মেশানো।

দাসেরা সব পালাচ্ছে। কাতারে কাতারে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমে, আরও পশ্চিমে, একেবারে নাইজারের দিকে। বালির সাগর পেরিয়ে কি করে পৌছুবে, ভাবছে না। এগিয়েই চলেছে। পানি নেই, খাবার নেই। কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান আবার খেতে বসে জটলা পাকাচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরেছে, এভাবে মরুভূমি পাড়ি দেবার চেষ্টা করা নির্ঘাত মৃত্যুর সামিল। তার চেয়ে দেখাই যাক, কিছু খাবার আর পানি নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

ধোঁয়ার মেঘে কালো হয়ে গেছে শহরের উপরের আকাশ। নিজের নাম সার্থক

করার জন্যেই যেন মরার আগে কালো হয়ে গেছে ব্ল্যাকল্যান্ড। বিস্ফোরণ কিন্তু বন্ধ হয়নি। এখন অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের ব্যবধানে ঘটেই চলেছে। ক্রমেই আরও বেশি করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে একদা জমজমাট অতি বিস্ময়কর শহরটা।

ক্রমেই প্যালেসের দিকে এগিয়ে আসছে বিস্ফোরণ। বোনের হাত চেপে ধরল লুই ব্রেজন। দু'চোখে আতঙ্ক।

ওদিকে দমাদম ঘা পড়ছে লোহার দরজায়। দরজা ভাঙার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে উইলিয়াম ফার্নির লোকেরা। ওরা বুঝতে পারছে, ছাদ থেকে নামতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ হলো ছাদের ওপরে। থর থর করে কেঁপে উঠল ঘর।

'কি, কি হলো?' চোখ বড় বড় করে বোনের দিকে তাকাল লুই।

'বোধ হয় কামান দেগে দরজার পাল্লা ভাঙার চেষ্টা করছে ব্ল্যাকগার্ডেরা।'

'সর্বনাশ। তাহলে!'

'মাত্র একটা ভেঙেছে। আরও পাঁচটা ভাঙতে হবে ওদের।'

ঠিকই অনুমান করেছে জেন, কামানই ব্যবহার করছে ফার্নির লোকেরা। ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে বুঝল, ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামানো হচ্ছে কামান।

ওদিকে ক্রমেই আরও এগিয়ে আসছে রহস্যজনক বিস্ফোরণ। ভোর রাতের পর থেমে গিয়েছিল, আবার হট্টগোল উঠল হঠাৎ। এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল জেন। ফ্যাক্টরির দরজাটা খুলে গেছে। পিলপিল করে লোক বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। শ্রমিক কর্মচারীর দল। ওদের ভিড়ে নিজের সঙ্গীদেরও দেখল জেন। কিন্তু ফ্যাক্টরির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে মেরি ফেলোদের বন্দুকের মুখে কেন আসছে ওরা, বুঝতে পারল না।

দেখতে পেয়েছে মেরি ফেলোরাও। রাইফেল তুলে বিকট হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গেল ওরা শ্রমিক কর্মচারীদের দিকে।

কিন্তু নিরস্ত্র নয় ফ্যাক্টরির লোকেরাও। রাইফেল বন্দুক আছে ওদেরও। আবার শুরু হলো যুদ্ধ। লাশের পর লাশ গড়িয়ে পড়ল এসপ্ল্যানেডে। আবার রক্তনদী বইল।

দু'হাতে চোখ ঢেকে জানালার কাছ থেকে সরে এল জেন। এদৃশ্য দেখা যায় না।

সমরবিদ্যায় শিক্ষিত মেরি ফেলোরা। ওদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না ফ্যাক্টরির যন্ত্রবিদের দল। ক্রমেই ওদের লাশের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কিন্তু গুলি চালানো বন্ধ হলো না।

মরিয়া হয়ে ফ্যাক্টরির লোকজন আর সঙ্গীদের বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করল জেন। টলতে টলতে বোনকে সাহায্য করতে কোনমতে এগিয়ে গেল লুইও।

প্যালেসে ঢোকার প্রধান গেটটা খুলে দিল জেন। পেছনে পাল্লার আড়ালে থেকে সমানে গুলি চালিয়ে গেল মেরি ফেলোদের ওপর। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে গুলি চালাতে লাগল লুই। যত সামান্যই হোক পেছন থেকে আক্রান্ত হয়ে একটু ঘাবড়ে গেল মেরি ফেলোরা। এই সুযোগে বেশ কয়েকজনকে শেষ করে দিল

ফ্যাক্টরিবাসীরা।

হঠাৎই বুঝতে পারল মেরি ফেলোরা, ইস্পাতের পাল্লার ওপারে বড়জোর দুই কি তিনজন মানুষ আছে। ঘুরে দাঁড়িয়েই কয়েকজন ছুটে এল পাল্লার দিকে।

কিন্তু ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে আবার ইস্পাতের পাল্লা।

চোদ্দ

পরিষ্কার বুঝল জেন, এভাবে আর বড়জোর কয়েক ঘণ্টা টিকতে পারবে ফ্যাক্টরিবাসীরা। শেষ পর্যন্ত মরতেই চলেছে তারা।

ওদিকে আরও একটা দরজা ভেঙে ফেলেছে উইলিয়াম ফার্নির লোকেরা। ক্রমেই এগিয়ে আসছে ওরাও।

বিস্ফোরণের শব্দ আরও এগিয়ে আসছে। সমানে চলছে গোলাগুলির আওয়াজ।

আবার আগের ঘরে ফিরে এল জেন। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরিবাসী। নতুন উদ্যমে এগোচ্ছে মেরি ফেলোরা। ওদিকে আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, আরেকটা দরজা ভেঙে ফেলেছে ফার্নির লোকেরা। দিশেহারা হয়ে পড়ল জেন।

ঠিক এই সময় শোনা গেল বিউগলের আওয়াজ। যুদ্ধের বাজনা। ফরাসী। দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল জেনের বুক। ভয়ে নয়, আনন্দে। যেভাবেই হোক, ফরাসী সৈন্যের একটা দল এসে চড়াও হয়েছে ব্ল্যাকল্যান্ডের ওপর।

মিনিটখানেক পরেই একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকশো রাইফেল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল জেন, কাতারে কাতারে লুটিয়ে পড়ছে মেরি ফেলোর দল। এভাবেই গতরাতে মেরেছিল নিগ্রোদের ওরা। রেড রিভারের অন্য পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ফরাসী সৈন্যের এক বিশাল দল।

প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কাসল ব্রিজের দিকে ছুটে গেল মেরি ফেলোরা। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে এই সময় উড়ে গেল ব্রিজ। হঠাৎই বুঝতে পারল জেন ব্যাপারটা। দেখেশুনে পরিকল্পনা মাফিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে কেউ। শুধু ব্ল্যাকল্যান্ডের লোকদের ক্ষতি করার জন্যেই। মারসেল ক্যামারেট বলেছিলেন, শহরের প্রতিটি বাড়ি, রাস্তার তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে শক্তিশালী মাইন। ওগুলোই পালা করে একে একে ফাটাচ্ছেন তিনি। নিজের হাতে গড়া অত্যাশ্চর্য শহরকে নিজের হাতেই ধ্বংস করে দিচ্ছেন প্রতিভাবান লোকটা।

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পালাতে চেষ্টা করল মেরি ফেলোরা। কিন্তু পারল না। ওপার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে বিদ্ধ করতে লাগল তাদের। কুকুর-বেড়ালের মত মরতে লাগল ওরা। একদিন এভাবেই মানুষ মেরেছে ওরাও।

খালি হয়ে গেছে এসপ্ল্যানেড। আর দেরি করল না জেন। ভাইকে নিয়ে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। ছুটে গিয়ে মিশল ফ্যাক্টরিবাসীদের দলে। গুলি বন্ধ

করার আদেশ দিল ক্যাপ্টেন মারসিনে। তাড়াতাড়ি দড়ির সেতু বানিয়ে সৈন্যদের রেড রিভার পেরোনোর আদেশ দিল।

স্তব্ধ হয়ে শহরের শোচনীয় দৃশ্য দেখছে মারসিনে। পাক খেয়ে খেয়ে কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। রেড রিভারের পাড় থেকেই দেখা যাচ্ছে মাটিতে পড়ে থাকা অগুণতি মানুষের লাশ। সারা শহরের মধ্যে মাত্র দুটো বিশাল অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে। এখনও ক্যাপ্টেন মারসিনের জানার কথা নয়, একটা অত্যাশ্চর্য শহরের অত্যাশ্চর্য ফ্যাক্টরি, অন্যটা এই শহরেরই মহা পরাক্রমশালী নিষ্ঠুর দুর্ধর্ষ সম্রাটের প্রাসাদ।

দড়ির সেতু বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সৈনিকেরা। ভাবছে মারসিনে, যাকে দেখার জন্যে এই দীর্ঘ পথ ছুটে এসেছে সে, তার দেখা কি পাবে এখানে? এখান থেকেই ডাক পাঠানো হয়েছিল টিম্বাকটুতে? অনেক কষ্টে কর্নেল অবানকে রাজি করিয়ে, সৈন্য নিয়ে দুর্গম পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিকানা মোতাবেক এসেছে ক্যাপ্টেন মারসিনে। সঙ্গে তার এঞ্জিনীয়ার বন্ধুও এসেছে।

বিচিত্র রেডিও নিয়ে বার বার রহস্যজনক সংবাদ প্রেরকের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছে ক্যাপ্টেন পেরিগনি। পারেনি। তাহলে আরও আগেই এসে পৌঁছতে পারত এখানে।

জেনের জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ক্যাপ্টেন মারসিনে। আরও দ্রুত সেতু তৈরির জন্যে তাড়া লাগাল সে সিপাইদের।

একে একে শহরের সমস্ত বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, ব্রিজ উড়িয়ে দিলেন মারসেল ক্যামারেট। প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন শেল বিঁধছে তাঁর নিজেরই বুকে। তাঁর অত সাধের সৃষ্টি ধ্বংস করে দিতে হচ্ছে নিজের হাতেই। তবু যদি নিপীড়িত লোকগুলোকে বাঁচানো যায়। ওদের দুর্ভাগ্যের জন্যে পুরোপুরি নিজেকে দায়ী করছেন তিনি। ফ্যাক্টরিটা ধ্বংস করার ইচ্ছে তাঁর নেই। এটা খাড়া থাকলে আবার এই শহর নির্মাণ করতে পারবেন তিনি। তবে এবারে আর হ্যারি কিলারের মত কোন লোককে রাজত্ব করতে দেবেন না।

টাওয়ার থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। এসপ্ল্যানেডে মেরি ফেলোদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু ফ্যাক্টরিবাসীরা বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছে।

হঠাৎই এই সময় প্যালেসের ছাদে একটা লোককে দেখা গেল। স্বয়ং হ্যারি কিলার। রাইফেল তুলে ধরেছে এদিকেই। গুলির শব্দ হলো, মাত্র একটা। দু'হাতে বুক চেপে ধরলেন মারসেল ক্যামারেট। পড়ে গেলেন টাওয়ারের ছাদেই।

তিনটে দরজা ভাঙা হতেই কি মনে করে সিঁড়ি ঘরে উঠে এল উইলিয়াম ফার্নি। উঁকি মেরে দেখল, এসপ্ল্যানেডে তার একজন লোকও নেই। সবাই ছুটছে কাসল ব্রিজের দিকে। ব্রিজটা ধ্বংস হতেও দেখল সে। বুঝল, সব মারসেল ক্যামারেটের কাজ। দাঁতে দাঁত ঘষল কিলার।

রেড রিভারের দিকে চেয়ে দেখল গিজ গিজ করছে ফরাসী সৈনিকে। এসপ্ল্যানেডে ফ্যাক্টরিবাসী সশস্ত্র।

উইলিয়াম বুঝল, দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। এই সময়ই একজন লোককে ফ্যাক্টরি টাওয়ারে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। স্বয়ং মারসেল ক্যামারেট।

আর থাকতে পারল না উইলিয়াম। ছাদে বেরিয়ে এল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাইফেল তুলে গুলি করল বিজ্ঞানীকে। দেখল, বুক চেপে ধরে লুটিয়ে পড়লেন ক্যামারেট। বিকৃত হাসি ফুটে উঠল উইলিয়াম ফার্নির ঠোঁটে।

সাঁতরে ওপারে চলে গেল কয়েকজন সৈনিক। সঙ্গে শক্ত খুঁটি নিয়ে গেল। পুঁতে দিল মাটিতে। এপারেও খুঁটি গাড়া হলো। এই খুঁটিতে দড়ির সেতুর প্রান্তগুলো আটকে দেয়া হলো। তৈরি হয়ে গেল নদী পারাপারের ব্যবস্থা।

প্রথমেই পেরোল ক্যাপ্টেন মারসিনে। তারপর তার বন্ধু পেরিগনি। এরপর একে একে পেরিয়ে আসতে লাগল সৈনিকেরা।

সৈনিকদের নদী পেরোনো দেখছে ফ্যাক্টরিবাসীরা। জেন এবং তার সঙ্গী সাথীরাও দেখছে।

প্রথমে নদী পেরিয়ে আসা দীর্ঘ লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল জেন। ক্যাপ্টেন মারসিনে।

স্তব্ধ হয়ে গেল জেন। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। তবে কি···তবে কি মারসেল ক্যামারেটের পাঠানো খবর পেয়েছে মারসিনে?

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নদীর দিকে ছুটে গেল জেন।

অনেক কষ্টে বুকে হেঁটে পাওয়ারের ভেতর চলে এলেন শেষ পর্যন্ত মারসেল ক্যামারেট। 'ঈশ্বর, একটু, আর একটু শক্তি দাও আমাকে। শুধু একটু।' বিড় বিড় করে প্রার্থনা করে জানালেন তিনি। মুখ দিয়ে দমকে দমকে রক্ত উঠে এল। বুঝতে পারলেন, ফুসফুসে লেগেছে গুলি।

রেডিও রিসিভার রাখা টেবিলটার গোড়ায় চলে এলেন তিনি। হামাগুড়ি দিতে দিতে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। শ্বাস নিতে সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে।

টেবিলের পায়া খামচে ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন ক্যামারেট। কিন্তু পারছেন না। শরীরের শক্তি একবারে শেষ।

দু'হাত বাড়িয়ে পায়াটা দুই হাতে চেপে ধরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন ক্যামারেট। টেবিলের কোনার কাছে পৌঁছে গেল ডান হাতটা। ধরলেন। বাঁ হাতটাও বাড়িয়ে দিলেন। ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরলেন দুই হাতে। আর একবার প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের কাছে, যেন কাজটা শেষ করে যেতে পারেন।

দড়াম করে টেবিলের উপরই পড়ে গেলেন ক্যামারেট। শরীরের ওপরের দিকটা টেবিলের ওপর, কোমর থেকে নিচের দিকে ঝুলছে মেঝে থেকে আধইঞ্চি ওপরে। পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন টেবিলে পাকাপোক্তভাবে বসানো রেডিওর মেটাল কাভার।

কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিলেন ক্যামারেট। তারপর ডান হাতটা আস্তে বাড়ালেন সুইচের দিকে। অসংখ্য সুইচের মাঝে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের দুটো সুইচ। একটা লাল, অন্যটা নীল। নীল সুইচটাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য। তর্জনীর সংস্পর্শে আসতেই টিপে দিলেন তিনি সুইচটা। পরমুহূর্তেই লালটা।

প্রায় এক সঙ্গেই দুটো প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণ ঘটল। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এসপ্ল্যানেডে দাঁড়ানো লোকগুলো। চোখের সামনেই দেখতে পেল, প্যালেস আর ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর ঠিক মাঝখানটা ভেঙেচুরে শূন্যে উঠে গেল। নেমে এল অপেক্ষাকৃত ধীরে। চাপা একটা গুম গুম শব্দ উঠল মাটির তল থেকে। একে একে আরও অনেকগুলো বিস্ফোরণের শব্দ হলো। বিশাল দুটো অট্টালিকা নষ্ট হয়ে যেতে বড়জোর পনেরো সেকেন্ড লাগল।

একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল মারসেল ক্যামারেটের অতি সাধের ফ্যাক্টরি আর উইলিয়াম ফার্নি ওরফে হ্যারি কিলারের প্যালেস।

মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল ধু ধু মরুর বুকে। মরুই। একে আর ব্ল্যাকল্যান্ড শহর বলা চলে না। একেবারে ধ্বংসস্তূপ। চারদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু পোড়া ইঁটকাঠ, আকাশে কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া। শোনার কিছু নেই, দেখার নেই কিছু।

অভিযাত্রীদের চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল দুঃস্বপ্নের নগরী, ব্ল্যাকল্যান্ড।

যার যার দেশে ফিরে এসেছে বারজাক মিশনের সবাই। ফ্যাক্টরির শ্রমিক কর্মচারীরাও ফিরেছে। পেছনে ব্ল্যাকল্যান্ডের ধ্বংসস্তূপের তলায় রেখে এসেছে বিশজন সহকর্মীকে।

নিগ্রোদের ভোট দেবার অধিকার নিয়ে আর মাথা ঘামান না মঁসিয়ে বারজাক। তবে গুজব শোনা যাচ্ছে, শিগ্‌গিরই মন্ত্রী হতে চলেছেন তিনি।

আবার রোগ আর রোগী নিয়ে পড়েছেন ডাক্তার চাতোন্নে।

অঙ্কের জগতে ফিরে গেছেন মঁসিয়ে পঁসি। মানুষের চুল নখ ইত্যাদি প্রতি সেকেন্ডে কতটা করে বাড়ে হিসেব করে বার করে ফেলেছেন তিনি। আরও অত্যাশ্চর্য সব হিসাব নিকাশ করছেন। প্রতিটি মানুষের মাথায় কত চুল এবং প্রতিটি কালো ভালুকের গায়ে কত লোম, বার করার তালে আছেন। দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা, এও তাঁর চিন্তার বিষয়।

সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিল ক্যাপ্টেন মারসিনে। জেন আর লুইয়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডে এল। তাদের সঙ্গেই এল মালিক আর টোনগানে। কিছুতেই জেনকে ছেড়ে থাকতে রাজি নয় ওরা। বলে কয়ে ওদের সঙ্গে নিতে জেনকে রাজি করিয়েছে সেন্ট বেরেনই। তবে বলার সময় দু'হাতে দুই গাল চেপে ধরে রেখেছে, আবার না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চুমু খেয়ে বসে মালিক।

মেয়ের মুখে সবকথা শুনলেন লর্ড ব্লেজন। অনেকদিন পর নিজের কামরা থেকে বাইরে বাগানে বেড়াতে বেরোলেন তিনি। হাসি ফুটেছে মুখে। এরপর আর বেশিদিন বাঁচেননি তিনি, তবে যে ক'দিন বেঁচেছেন, শান্তিতেই কাটিয়েছেন।

না, কথা এখনও শেষ হয়নি।

দিনক্ষণ দেখে ক্যাপ্টেন মারসিনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল জেন ব্লেজনের।

মালিক আর টোনগানের বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করে দিল স্বয়ং সেন্ট বেরেন। অবশ্যই টোনগানের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল, যখনি প্রয়োজন মাছ ধরায়

সাহায্য করতে হবে বেরেনকে।

সেন্ট্রাল ব্যাংকের পুরো দায়িত্ব দেয়া হলো লুই ব্রেজনকে।

আরও একজনের কথা কিন্তু বলা হয়নি। আমিদী ফ্লোরেন্স। সে মিশনের সঙ্গে না গেলে, আর ডায়েরীতে সব কথা লিখে না রাখলে কিন্তু এই কাহিনীর কিছুই আপনারা জানতেন না। কাজেই একটা সত্যি ঘটনাকে গল্পের ঢঙে শোনানোর জন্যে অবশ্যই ধন্যবাদ দেবেন তাকে।

*****